হুমায়ুন আজাদ

কতো নদী সরোবর

বা বাঙলা ভাষার জীবনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

কতো নদী সরোবর

বা

বাঙলা ভাষার জীবনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

কতো নদী সরোবর
বা
বাঙলা ভাষার
জীবনী

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণ : অষ্টম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৮ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৩ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৯৮ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ : দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০২ জানুয়ারি ১৯৯৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ : চতুর্থ মুদ্রণ কার্তিক ১৪১১ অক্টোবর ২০০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : ষষ্ঠ মুদ্রণ আশ্বিন ১৪১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : সপ্তম মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৮ মে ২০১১

স্বত্ব মৌলি আজাদ, স্মিতা আজাদ ও অনন্য আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

ISBN 978 984 40 1421 5

Kato Nadi Sharobar ba Bangla Bhashar Jibani : So Many Rivers And Lakes or A Biography of the Bengali Language :
by Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
Phone : 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

First Published : February 1987
Second Edition : Eighth Printing : February 2012

Price : Tk. 150.00 Only

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মিতামণি

অনন্যমণি

যে-ভাষা এখন তোমাদের বুকের ভেতরে
যে-ভাষা একদিন হয়ে উঠবে তোমাদের জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বলেখ

দু-দশক আগে আমার এক প্রিয় সম্পর্কে একটি বই লিখেছিলাম কিশোরতরুণদের জন্যে। প্রিয়র নাম বাঙলা সাহিত্য, বইটির নাম *লাল নীল দীপাবলি*। বইটি বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস। তবে প্রথাগত রীতিতে আর ভাষায় লিখি নি ব'লে, আর লিখেছিলাম যেহেতু স্বপ্ন ও আবেগআলোড়িত কিশোরতরুণদের জন্যে, তাই তার রেখেছিলাম এমন নাম। কবিতা লেখার মতোই অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছিলাম বইটি; পাতায় পাতায় লেগেছিলো সৃষ্টিশীলতার ছোঁয়া। কয়েক বছর আগে আবার অনুপ্রাণিত হয়ে আমার আরেক প্রিয় সম্পর্কে লিখি এ-বইটি। এ-প্রিয়র নাম বাঙলা ভাষা। আমার ভেতরে এর নাম জেগে ওঠে *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী*। এটিও প্রথাগত রীতি ও ভাষায় ও প্রাজ্ঞ পাঠকদের জন্যে লিখি নি। লিখেছি কিশোরতরুণদের জন্যে, যাদের কাছে বাস্তবও অনেকটা স্বপ্নের মতো। জ্ঞান যাদের কাছে এক রকম আবেগ ও সৌন্দর্য। আমার দুই অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত প্রিয় সম্পর্কে কিশোরতরুণদের জন্যে দুটি বই লিখতে পেরে সুখ পাচ্ছি। এ-বইটি প্রথম বেরিয়েছিলো "ধানশালিকের দেশ"-এর একটি বিশেষ সংখ্যায়। আমার দুটি বই—*ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* ও এটি—খুবই অল্প সময়ের মধ্যে লিখেছিলাম এ-পত্রিকার সম্পাদকের আগ্রহে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোলো, এতে সুখ পাচ্ছি। ভালো লাগবে যদি বইটি আবারো গ্রহণ করে আবেগ ও স্বপ্নকাতর কিশোরতরুণেরা, কিশোরীতরুণীরা।

১৪ই ফুলার রোড : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা **হুমায়ুন আজাদ**

২৫ পৌষ ১৩৯৮ : ৯ জানুয়ারি ১৯৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

চাতকচাতকীর মতো ৯ জন্মকথা ১২ আদি-মধ্য-আধুনিক : বাঙলার
জীবনের তিন কাল ১৫ গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ ১৭ কালিন্দীর কূলে
বাঁশি বাজে ২৪ হাজার বছর ধ'রে ৩০ ধ্বনিবদলের কথা ৩৩
ধ্বনিপরিবর্তন : শব্দের রূপবদল ৩৭ আমি তুমি সে ৪৫ জলেতে উঠিলী
রাহী ৫০ বহুবচন ৫৪ আইসসি যাসি করসি ৫৭ সোনালি রুপোলি শিকি
৬০ বাঙলা শব্দ ৬২ ভিন্ন ভাষার শব্দ ৬৫ বাঙলা ভাষার ভূগোল ৬৮
আ কালো অ শাদা ই লাল ৭৫ গদ্যের কথা ৭৮ মান বাঙলা ভাষা : সাধু ও
চলতি ৮৭ অভিধানের কথা ৯৩ ব্যাকরণের কথা ৯৮ যে-সব বঙ্গেত জন্মি
১০১ বাঙলা ভাষা : তোমার মুখের দিকে ১০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাতকচাতকীর মতো

চাতকচাতকী আমি কখনো দেখি নি। তবে স্বপ্নজাগানো একটি গল্প শুনেছি আমার অদেখা ওই পাখি সম্পর্কে। পিপাসায় বুক ফেটে যেতে চায় চাতকের। দরকার তার ঠাণ্ডা জল। চারদিকে কতো দিঘি হ্রদ সাগর। কতো নদী সরোবর, কিন্তু তাতে, কবি রামনিধি গুপ্ত প্রশ্ন করেছেন, কিবা ফল চাতকীর? চাতকচাতকীর পিপাসা তো মিটবে না পদ্মদিঘির জলে। ঝর্নাধারায়, নদীর স্রোতে, সরোবরের টলটলে পানিতে। তার চাই মেঘগলা ঠাণ্ডা জল। চাতকচাতকী ডাকে, 'ঠাণ্ডা মেঘ, কালো মেঘ, জল দাও। তোমার ধারাজল ছাড়া কিছুতেই যে পিপাসা মেটে না।' এক সময় নীল আকাশের কালো মেঘ গ'লে বৃষ্টি নামে। আকাশ থেকে রুপোর রেখার মতো নেমে আসা বৃষ্টির জল পান ক'রে তৃষ্ণা মেটে চাতকের। চাতকীর। আর কোনো জলে—ওই নদীর, দিঘির, ঝর্নার, সাগরের, সরোবরের জলে—পিপাসা মেটে না তাদের। আমরা সবাই ওই চাতকচাতকীরই মতো।

কতো ভাষা এই পৃথিবীতে। বাঙলা ইংরেজি ফরাশি জর্মন জাপানি রুশ তামিল তেলুগু মালায় আরবি ফারসি হিন্দি আসামি ওড়িয়া হিব্রু ও আরো কতো ভাষা। ইচ্ছে করলে আর সুযোগ পেলে আমরা শিখতে ও বলতে পারি যে-কোনো ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের রয়েছে একটি আপন ভাষা : মাতৃভাষা। যে-ভাষা তার মায়ের, যে-ভাষা তার বাবার। যে-ভাষা তার সমাজের অন্যান্যের; যে-ভাষা তার নিজের। নিজ ভাষা ব'লে আর শুনে যে-সুখ, তা পাওয়া যায় না অন্য কোনো ভাষায়। প্রতিটি মানুষের মূল পরিচয় তার ভাষায়। তার জাতীয় পরিচয়ও খচিত তার ভাষায়। প্রতিটি মানুষ তার আপন ভাষার চাতক। প্রত্যেকের নিজ ভাষা তার কাছে মেঘগলা বৃষ্টির জলের মতো। তার ঠাণ্ডা আদর ছাড়া মানুষের পিপাসা মেটে না। কতোদিন আমি দূরদেশে, তিন বছর ধ'রে, বাসে চেপে পায়ে হেঁটে তুষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠেলে বন্ধুর বাসায় টোকা দিয়েছি শুধু একটু বাঙলা বলবো ব'লে। শুধু একটু বাঙলা শুনবো ব'লে। এমন হয় সব মানুষেরই। পৃথিবীতে কতো ভাষা, তবু শুধু একটি ভাষাই তার কানের ভেতর দিয়ে মর্মে পশে। পৃথিবীতে কতো মা, তবু শুধু একজনের জন্যেই চোখ জলে ভ'রে ওঠে। আনচান করে প্রাণ।

বাঙলা আমার মাতৃভাষা। আমাদের মাতৃভাষা। তার রূপ আর শোভায় আর সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ। পৃথিবীতে আরো বহু ভাষা আছে। তাদের কোনোটির সৌন্দর্যে অন্ধ হয়ে যায় চোখ। কোনোটির ঐশ্বর্যের কাছে নুয়ে আসে মাথা। কোনোটির দর্পের কাছে হার মানতে হয় মুখোমুখি হওয়ার সাথেসাথে। তবুও আমার কাছে বাঙলার মতো আর কোনো ভাষা নেই। বাঙলা আমার মাতৃভাষা। আমার ভাষা। আমার আনন্দ এ-ভাষায় নেচে ওঠে ময়ূরের মতো। আমার সুখ ভোরের রৌদ্র বিকেলের ছায়া আর সন্ধ্যার আভার মতো বিচ্ছুরিত হয় বাঙলা ভাষায়। আমার বেদনা আমার দুঃখ থরোথরো ক'রে ওঠে বাঙলা ভাষায়। আর কোনো ভাষা আমার দুঃখে কাতর হয় না। আর কোনো ভাষা পুলকিত শিহরিত মর্মরিত আকুল ব্যাকুল চঞ্চল অধীর হয় না আমার সুখে আমার আনন্দে।

আমি বাঙলা ভাষার রূপে আর শোভায় আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ। আমার মায়ের মুখের মতো সে শান্ত। তার অশ্রুর মতো সে কোমলকাতর। আমার মায়ের দীর্ঘশ্বাসের মতোই নরম আমার মাতৃভাষা। কখনো সে অন্য রূপ নেয়, শোভা ছড়িয়ে দেয়। মুগ্ধ করে আমাকে অন্যভাবে। তাকে দেখে আমার চাঁদের কিরণের কথা মনে পড়ে; জ্যোৎস্নায় ছেয়ে যায় চারদিক। তার শরীর থেকে দ্যুতি ঠিকরে পড়ে। ঝলমল ক'রে ওঠে চিত্ত। যখন বাঙলা ভাষা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তখন আমার চণ্ডীদাসের নাম মনে পড়ে। তার উল্লাসে আমার মনে পড়ে মধুসূদনের মুখ। তার থরোথরো ভালোবাসার নাম আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ। তার বিজন অশ্রুবিন্দুর নাম জীবনানন্দ। তার বিদ্রোহের নাম নজরুল। বাঙলা আমার ভাষা। এ-ভাষা ছাড়া আমি নেই।

হাজার বছর আগে জন্ম হয়েছিলো বাঙলা ভাষার। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা মানুষের মুখেমুখে রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিলো এক মধুর-কোমল-বিদ্রোহী প্রাকৃত। তার নাম বাঙলা। তাকে কখনো বলা হয়েছে 'প্রাকৃত', কখনো বলা হয়েছে 'গৌড়ীয় ভাষা'। কখনো বলা হয়েছে 'বাঙ্গালা', কখনো 'বাঙ্গলা'। এখন বলি 'বাঙলা' বা 'বাংলা'।

এ-ভাষায় লেখা হয় নি কোনো ঐশী শ্লোক। জন্মের সময় বাঙলা ভাষা স্নেহ পায় নি সমাজপ্রভুদের। কিন্তু তা হাজার বছর ধ'রে বইছে ও প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে কোটিকোটি সাধারণ মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তব। বৌদ্ধ বাউলেরা এ-ভাষায় রচেছেন দুঃখের গীতিকা। বৈষ্ণব কবিরা ভালোবেসেছেন হাহাকার করেছেন এ-ভাষায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা এ-ভাষায় রচনা করেছেন লৌকিক মঙ্গলগান। এ-ভাষায় রচিত হয়েছে আধুনিক মানুষের কতো না উপাখ্যান। এ-ভাষার জন্য উৎসর্গিত হয়েছে আমার ভাইয়ের রক্ত। এ-ভাষার জল ছাড়া আমার পিপাসা মেটে না। আমার স্বপ্ন ভেঙে যায় এ-ভাষা ছাড়া। এ-ভাষা ছাড়া থেমে যায় আমার বাস্তব। আমার জীবন। আমি তার গান গাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মকথা

কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাঙলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাঙলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় নি। বা কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকে আসে নি। এখন আমরা যে-বাঙলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিলো না। এক হাজার বছর পরও ঠিক এমন থাকবে না। বাঙলা ভাষার আগেও এ-দেশে ভাষা ছিলো। সে-ভাষায় এ-দেশের মানুষ কথা বলতো, গান গাইতো, কবিতা বানাতো। ভাষার ধর্মই বদলে যাওয়া। মানুষের মুখেমুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেক দিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। বাঙলা ভাষার আগেও এ-দেশে ভাষা ছিলো। আর সে-ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাঙলা ভাষার।

আজ থেকে এক শো বছর আগেও কারো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না বাঙলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে। কেউ জানতো না কতো বয়স এ-ভাষার। জানতো না কোন ভাষা থেকে জন্ম নিয়েছে বা উদ্ভূত হয়েছে বাঙলা ভাষা। তখন একে কেউ বলতো বাঙ্গালা ভাষা। কেউ বলতো প্রাকৃত ভাষা। কেউ বলতো গৌড়ীয় ভাষা। ভারতবর্ষের একটি পবিত্র ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয় বাঙলা ভাষায়। একদল লোক মনে করতেন ওই ভাষাই বাঙলার জননী। বাঙলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্ট মেয়ে, যে মায়ের কথা মতো চলে নি। না চ'লে চ'লে অন্য রকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাঙলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে বাঙলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটে নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিলো হিন্দু সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষের লেখার ভাষা। তা কথ্য ছিলো না। কথা বলতো মানুষেরা নানা রকম 'প্রাকৃত' ভাষায়। প্রাকৃত ভাষা হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথ্য ভাষা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃত থেকে নয়, প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভব ঘটেছে বাঙলা ভাষার।

কিন্তু নানা রকম প্রাকৃত ছিলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। তাহলে কোন প্রাকৃত থেকে উদ্ভব ঘটেছিলো বাঙলার? এ-সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন। বহু প্রাকৃতের একটির নাম মাগধী প্রাকৃত। তাঁর মতে মাগধী প্রাকৃতের কোনো পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে জন্ম নেয় বাঙলা ভাষা। পরে বাঙলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের চোখে স্পষ্ট ধরা দেয় বাঙলা ভাষার ইতিহাস। সে-ইতিহাস বলার জন্যে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। পিছিয়ে যেতে হবে অন্তত কয়েক হাজার বছর।

ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে শব্দে লক্ষ্য করা যায় গভীর মিল। এ-ভাষাগুলো যে-সব অঞ্চলে ছিলো ও এখন আছে, তার সবচেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ আর পুবে ভারত। ভাষাবিজ্ঞানীরা এ-ভাষাগুলোকে একটি ভাষাবংশের সদস্য ব'লে মনে করেন। ওই ভাষাবংশটির নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ বা ভারতী-ইউরোপীয় ভাষাবংশ। এ-ভাষাগুলোকে আর্যভাষা নামেও ডাকা হতো এক সময়। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশে আছে অনেকগুলো ভাষা-শাখা, যার একটি হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন ভাষাগুলোকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলোতে। এগুলো সম্ভবত লিখিত হয়েছিলো জেসাস ক্রাইস্টের জন্মেরও এক হাজার বছর আগে; অর্থাৎ ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ-সময় আর্যরা আরো নানা "বেদ"ও রচনা করেন। বেদের শ্লোকগুলো খুব পবিত্র; তাই অনুসারীরা মুখস্থ করে রাখতো ওই সব শ্লোক। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে যেতে থাকে। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে-ভাষা ব্যবহার করতো বদলে যেতে থাকে সে-ভাষা। এবং এক সময় সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হ'য়ে ওঠে বেদের ভাষা বা বৈদিক ভাষা। তখন ব্যাকরণবিদেরা নানা নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে একটি মান ভাষা সৃষ্টি করেন। ওই ভাষার নাম 'সংস্কৃত'; অর্থাৎ বিধিবদ্ধ, পরিশীলিত, শুদ্ধ ভাষা। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের আগেই এ-ভাষা বিধিবদ্ধ হয়েছিলো।

সংস্কৃত ছিলো লেখা ও পড়ার ভাষা। তা কথ্য ছিলো না। তখন ভারতবর্ষে যে-কথ্য ভাষাগুলো ছিলো, সেগুলোকে বলা হয় প্রাকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেসাসের জন্মের আগেই তাই পাওয়া যায় ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির নাম বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দ এ-ভাষার কাল। তারপর পাওয়া যায় সংস্কৃত; খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ অব্দের দিকে এটি সম্ভবত বিধিবদ্ধ হ'তে থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতে এটি চরমভাবে বিধিবদ্ধ হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতকে বলা হয় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাকৃত ভাষাগুলোকে বলা হয় মধ্যভারতীয় আর্যভাষা। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ-ভাষাগুলো কথ্য ও লিখিত ভাষারূপে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত থাকে। এ-প্রাকৃত ভাষাগুলোর শেষ স্তরের নাম অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ অর্থাৎ যা খুব বিকৃত হয়ে গেছে। এ-অপভ্রংশরাশি থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা—বাঙলা, হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ভাষা।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি অপভ্রংশের নাম বলেন মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশের আবার তিনটি শাখা। একটির নাম পূর্ব-মাগধী অপভ্রংশ; আরেকটির নাম মধ্য-মাগধী অপভ্রংশ, এবং আরেকটির নাম পশ্চিম-মাগধী অপভ্রংশ। তাঁর আগে এ-ভাগ করেছিলেন জর্জ গ্রিয়ারসন; সুনীতিকুমার অনুসরণ করেন গ্রিয়ারসনকেই। পূর্ব-মাগধী অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বাঙলা, আর আসামি ও ওড়িয়া ভাষা। তাই বাঙলার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আসামি ও ওড়িয়ার। আরো কয়েকটি ভাষারও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে বাঙলার সাথে; কেননা সেগুলোও জন্মেছিলো মাগধী অপভ্রংশের অন্য দুটি শাখা থেকে। ওই ভাষাগুলো হচ্ছে মৈথিলি, মগহি, ভোজপুরিয়া। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি একটি প্রাকৃতের নাম বলেন গৌড়ী প্রাকৃত। তিনি মনে করেন গৌড়ী প্রাকৃতেরই পরিণত অবস্থা গৌড়ী অপভ্রংশ থেকে উৎপত্তি ঘটে বাঙলা ভাষার। এ-মতটিকে অবশ্য বেশি লোক মানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি-মধ্য-আধুনিক :
বাঙলার জীবনের তিন কাল

কখন জন্মেছিলো বাঙলা ভাষা? কারা সেই প্রথম বাঙালি, যাদের কণ্ঠে বেজে উঠেছিলো একটি নতুন ভাষা, যার নাম বাঙলা? ঠিক একটি বাঙলা ভাষাই কি জন্ম নিয়েছিলো সেই ধূসর অতীতে? নাকি বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো বিভিন্ন রকম বাঙলা ভাষা? তা ঘটেছিলো কোন শতাব্দীতে? খুব নিশ্চিত ক'রে কিছুই বলা যায় না। কারণ যে-দিন জন্মেছিলো বাঙলা সে-দিনই তা কেউ লিখে রাখে নি। মানুষের বুক থেকে মানুষের মুখে এসে ধ্বনিত হয়ে আদি বাঙলা ভাষা মিশে গেছে আকাশেবাতাসে। তবে বাঙলা ভাষার জন্মের কাল সম্পর্কে নানা অনুমান করতে পারি আমরা, যেমন অনুমান করেছেন বাঙলা ভাষার বিভিন্ন ঐতিহাসিক।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাঙলা ভাষার জন্মলগ্নের খোঁজে একটু বেশি অতীতে যেতে ভালোবাসেন। তিনি মনে করেন ৬৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ী প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিলো আধুনিকতম প্রাকৃত বাঙলা ভাষা। এতো আগে বাঙলা ভাষার জন্ম না হ'লেও বাঙলা পৃথিবীর জীবিত ভাষাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত বয়স্ক ভাষা। তবে আজকাল এতো বয়স্ক মনে করা হয় না বাঙলা ভাষাকে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ৯০০ বা ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ দশম শতকে, মাগধী অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছিলো কোমল-মধুর-বিদ্রোহী বাঙলা ভাষা। এ-হিশেবেও বাঙলা ভাষার বয়স এক হাজার একশো বছর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতই আজকাল গৃহীত।

হাজার বছর আগে যে-বাঙলা ভাষা বেজে উঠেছিলো আদি বাঙালিদের কণ্ঠে, তার সাথে আজকের বাঙলার অমিল অনেক। প্রথম জন্মের পর কেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছে অনেক অন্ধকার শতাব্দী, জ্যোৎস্নায় জড়ানো অনেক শতক। বাঙলা ভাষাও জ্যোৎস্না অন্ধকার ভেঙে এগিয়েছে সামনের দিকে। জন্মকালে যে-বাঙলা ভাষা ছিলো, তা আজ শুনলে মনে হয় বহু অতীতের কণ্ঠস্বর শুনছি। যার কিছুটা বুঝি, বুঝি না অনেকটা। যার স্বর চেনা মনে হয় কখনো, আবার মনে হয় অচেনা। যেনো স্বপ্নের মধ্যে শুনছি জড়িয়ে-যাওয়া এক আধো অপরিচিত আধো পরিচিত ভাষা। ভাষা বদলে যায় কালেকালে; বদলে গেছে বাঙলা ভাষাও। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শতকে বিভিন্নভাবে বদলে, সুন্দর শক্তিশালী রূপময় হয়ে, গ'ড়ে উঠেছে আজকের বাঙলা ভাষা। কিন্তু তা এমন ছিলো না দুশো বছর আগে। আবার দুশো বছর আগে যেমন ছিলো, ঠিক তেমনি ছিলো না চারশো বছর আগে। আবার তেমন ছিলো না জন্মের লগ্নে জন্মের শতকে।

সেই পুরোনো সেই প্রথম কালের বাঙলা ভাষাকে বলা হয় প্রাচীন বাঙলা বা আদি বাঙলা ভাষা। সে-ভাষা সহজে বোঝা যায় না। পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা প'ড়ে বুঝতে হয়। ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ;—এই আড়াই শো বছরে বাঙলা ভাষা যে-রূপ নিয়েছিলো, তাকে বলা হয় আদি বাঙলা ভাষা। "চর্যাপদ" নামে একগুচ্ছ গান পাওয়া গেছে। ওই গানগুলো লেখা হয়েছিলো আদিযুগের বাঙলা ভাষায়। আদিযুগের পরের বাঙলা ভাষাকে বলা হয় মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা। মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা অতো সুদূর অচেনা নয়—অনেক কিছু বোঝা যায় তার। যদিও সবটা বোঝা যায় না। কিন্তু বোঝা যায় অনেক কিছু। তার অনেক শব্দ আজকের শব্দের মতো, তার ধ্বনি আজকের ধ্বনির মতোই অনেকটা। বাঙলা ভাষার মধ্যযুগটি খুব দীর্ঘ। ছ-শো বছরের এ-যুগ। ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে যে-বাঙলা ভাষা কথিত হতো, আর পাওয়া গেছে যার লিখিত রূপ, তাকে বলা হয় মধ্যযুগের বাঙলা ভাষা। মধ্যযুগের শুরুতেই আছে দেড় শো বছরের একটি ছোট্ট যুগ। ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের বাঙলা ভাষাকে বলা হয় আঁধার যুগের বা ক্রান্তিকালের বাঙলা ভাষা। ১৮০১ থেকে শুরু হয় আধুনিক বাঙলা ভাষা। উনিশ শতকের বাঙলা আর আজকের বাঙলার মধ্যেও অমিল অনেক। তবু ওই বাঙলারই পরিণতি বিশশতকের বাঙলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ

গঙ্গা যমুনার মাঝে নৌকা বয় রে। হাজার বছর আগে যদি এ-কথাটি বলতে হতো আমাকে, তাহলে বলতাম : গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ; —যেমন বলেছিলেন বাঙলা ভাষার প্রথম যুগের এক কবি ডোম্বীপাদ। ওই আদি বাঙলা ভাষা হারিয়ে গিয়েছিলো। আশি বছর আগেও কোনো বাঙালি জানতো না কেমন ছিলো প্রথম যুগের বাঙলা ভাষা। মানুষের মুখের কথা তো খাঁচা-ছেড়ে-উড়ে-যাওয়া পাখির মতো, সে-পাখি আর কখনো খাঁচায় ফিরে আসে না। কথা বলার সময় মুখ থেকে মুখর হয়ে ওঠে যে-ধ্বনিগুলো, সেগুলো মিলিয়ে যায় আকাশেবাতাসে। কেউ আর তাদের ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু যদি লিখিত হয়ে যায় কথাগুলো, তাহলে তা টিকে থাকে বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। প্রাকৃত থেকে, হাজার বছর আগে কোনো এক সময়ে, বঙ্গীয় ভূখণ্ডে যখন জন্ম নিয়েছিলো বাঙলা ভাষা, ধ্বনিত হয়ে উঠেছিলো তার স্বর আর ব্যঞ্জন, ঠিক তখনি কেউ সে-ভাষা লিখে ফেলে নি কাগজে বা গাছের বাকলে বা ভূর্জপত্রে। তাই প্রথম যুগের বাঙলা ভাষা মিশে গেছে আকাশেবাতাসে। তারপর এক সময় বুকের গান বাঙলা ভাষায় ধ্বনিত করতে শুরু করেন আমাদের প্রথম কবিরা। কিন্তু সেটা তো লেখার সময়, ছাপাখানার সময় ছিলো না। অনেক কবি হয়তো লিখতেই জানতেন না, কিন্তু বুক থেকে তাঁদের গান উঠতো। তাঁদের চোখ ছবি দেখতো। এক সময় তাঁদের গান লিখিত হয়। বাঁধা পড়ে কালি আর কাগজের বা অন্য কিছুর সোনার খাঁচায়। বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে বন্ধনহীন বাঙলা ভাষা। সেই আদিম রহস্যময়, সুদূর, আলোআঁধারজড়ানো বাঙলা ভাষার কথা কেউ জানতো না ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগে। হারিয়ে গিয়েছিলো আদি বাঙলা ভাষা। বিদেশে লুকিয়ে ছিলো কোনো আবিষ্কারকের প্রতীক্ষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন অমর হয়ে গেছেন ওই আদি বাঙলা ভাষা আবিষ্কার ক'রে। তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি সেই ভাগ্যবান, যাঁর চোখ প্রথম দেখতে পেয়েছিলো প্রথম যুগের বাঙলা ভাষার মুখ। যেনো তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলো বাঙলা ভাষা। ১৯০৭ অব্দে নেপালে যান মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থশালায় তিনি আবিষ্কার করেন চারটি পুথি। ওই পুথিগুলো তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে। এ-বইটিতে সংকলিত হয়েছিলো চারটি বই। বইগুলো হচ্ছে "চর্য্যচর্য্যবিনিশ্চিয়", সরোজবজ্রের "দোহাকোষ", কৃষ্ণাচার্যের "দোহাকোষ", ও "ডাকার্ণব"। এ-গুলোর মধ্যে "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"-এর গানগুলোই লেখা হয়েছিলো আদি যুগের বাঙলা ভাষায়। "চর্য্যাচর্য্যাবিনিশ্চয়" নামটি দিয়েছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁর এ-বই প্রকাশের পর সাড়া প'ড়ে যায় বাঙলার পণ্ডিতসমাজে—শিহরিত, বিস্মিত, উল্লসিত হন তাঁরা। কেননা বাঙলা ভাষার এতো পুরোনো নমুনা আর আগে দেখা যায় নি। "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"-এর নানা রকম নাম প্রস্তাব করেছেন পণ্ডিতেরা। কেউ বলেছেন এর নাম হওয়া উচিত "চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়"। কেউ বলেন এর নাম "চর্যাগীতিকোষ"। এখন এ-গানগুলো "চর্যাপদ" নামেই পরিচিত ও প্রিয়।

"চর্যাপদ" আদিযুগের বাঙলা ভাষায় লেখা কয়েকজন কবির গীতবিতান। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার ও প্রকাশ করেছিলেন যে-চর্যাপদগুচ্ছ, তাতে ছিলো ছেচল্লিশটি পুরো আর একটি খণ্ডিত পদ। অর্থাৎ মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ বা গান ছিলো তাঁর চর্যাপদে। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এ-গানগুলোর একটি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তাতে মনে হয় চর্যাপদের মোট গানের সংখ্যা ছিলো একান্ন। কয়েকটি পদ হয়তো নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন বিভিন্ন চর্যাপদ সংকলনে পাওয়া যায় পঞ্চাশটি পদ। এ-পদগুলো লিখেছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা—সিদ্ধাচার্যেরা। তেইশজন সিদ্ধাচার্য লিখেছিলেন এ-গানগুলো। এ-গানগুলোর ভাষা যেমন সূদূর, ভাব যেমন রহস্যময়, তেমনি সুদূর-রহস্যময় বাঙলা ভাষার প্রথম কবিদের নামগুলো। তাঁদের নাম এমন : কাহ্নপা, লুইপা, কুক্কুরীপা, বিরুআপা গুডরীপা ভুসুকুপা, সরহপা, শবরপা প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশি গান লিখেছেন কাহ্নপা, যাঁর অন্য নাম কৃষ্ণাচার্য বা কৃষ্ণাচার্যপাদ বা কৃষ্ণবজ্রপাদ। তিনি লিখেছেন তেরোটি গান। আর ভুসুকুপা লিখেছেন আটটি গান। অন্যরা কেউ একটি কেউ দুটি গান লিখেছেন। 'চর্যা' শব্দের অর্থ হলো 'আচরণ'। এ-গানগুলোতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা ধর্মের গূঢ় কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছেন, নির্দেশ করেছেন বিধিনিষেধ; অর্থাৎ সাধনার জন্য করতে হবে কী আচরণ, আর কী আচরণ পরিহার করতে হবে। তাই এগুলো তান্ত্রিক গাথা। সাধারণ পাঠক বা শ্রোতার জন্যে এগুলো রচিত নয়। শুধুমাত্র দীক্ষিতদের জন্যেই এ-রহস্যময় গানগুলো।

এ-গানগুলো মূল্যবান প্রাচীন বাঙলার সমাজের ছবির জন্যে; এবং কবিতার জন্যে। আমাদের প্রাচীনতম কবিদের বুকে কবিত্বের কোনো অভাব ছিলো না। তাঁদের আবেগ কবিতা হয়ে উঠেছে, তাঁদের দেখা দৃশ্য চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছে গানেগানে। মণিমাণিক্যের মতো তাঁরা কবিতাকে সাজিয়ে দিয়েছেন উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায়। এ-সবের জন্যে চর্যাপদ সোনার মতো দামি। কিন্তু তারচেয়েও বেশি দাম এর ভাষার জন্যে। কবিতা তো আরো পাওয়া যায়, ছবিরও অভাব নেই। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা তো ছড়িয়ে আছে বাঙলা কবিতার পদেপদে। কিন্তু এ-ভাষা আর পাওয়া যাবে কোথায়? কোথায় পাওয়া যাবে প্রথম বাঙালিদের কণ্ঠস্বর? কোথায় আর পাওয়া যাবে জন্মকালের বাঙলা ভাষার রূপ? কোথায় পাওয়া যাবে, এ-পঞ্চাশটি পদে ছাড়া? ভাষার জন্যে চর্যাপদ মাণিক্যের চেয়েও মূল্যবান।

চর্যাপদ পড়ার সময় মনে হয় যেনো হাজার বছরেরও আগের কারো কথা শুনছি। তাঁর কথা সবটা বুঝে উঠতে পারি না। আমার কথাও বুঝতেন না ওই কবিরা। আমি বলি : 'গঙ্গাযমুনার মাঝে নৌকা চলে।' তিনি বলেন : 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই।' আমি বলি : 'সোনায় ভরা আমার করুণা নৌকো।' তিনি বলেন : 'সোনে ভরিলী করুণা নাবী।' আমি বলি : 'অন্ধকার রাত, ইঁদুর চরছে।' তিনি বলেন : 'নিসি অন্ধারী মূসার চারা।' এভাবে তাঁর কথা আর আমার কথার মাঝে অনেকটা মিল আর অনেকটা অমিল। চর্যাপদ পড়ার সময় মনে হয় আমি যেনো স্বপ্নে কারো কথা শুনছি। তাঁর কথায় ছড়িয়ে গেছে আমার বাঙলা ভাষা। কিছুটা বুঝতে পারি আর অনেকটা বুঝতে পারি না। না পারারই কথা। কেননা এ তো হাজার বছরের আগের বাঙলা ভাষা।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বাঙলার আদিকবিরা আদি বাঙলা ভাষায় রচনা করেছিলেন এ-রহস্যময় আদিম সৌন্দর্যময় কবিতাগুচ্ছ। তাঁদের ভাষা বুঝতে পারি না; ভাব বুঝতে পারি না। চর্যাপদের কবিরাও জানতেন, তাঁরা যে-কথা বলেছেন তা খুবই কঠিন, সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। কবি কুক্কুরীপা তো স্পষ্টই বলেছেন যে তাঁর কথা 'কোড়ি-মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সনাইউ'; অর্থাৎ কোটিকের মাঝে গোটিকের মর্মে পশে তাঁর কথা। তাঁকে বুঝতে পারে এক-আধজন। কবি ঢেণ্ঢণপাও বলেছেন যে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান বোঝে খুব কম লোকেই—'ঢেণ্ঢণ-পাএর গীত বিরলে বুঝই।' কিন্তু এ তো ভাবের কথা। বেশ কঠিন তান্ত্রিক ধর্মীয় ভাবের কথা বলেছেন ঘরছাড়া সমাজছাড়া ওই সাধক কবিরা। তাঁদের ভাব বুঝতে হ'লে ঘর ছাড়তে হবে সমাজ ছাড়তে হবে। দীক্ষিত হ'তে হবে তাঁদের ধর্মে। কিন্তু ভাষা?

চর্যাপদের ভাষার মুখোমুখি বেশ বিচলিত বোধ করেছিলেন আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও। পুথি খুলেই যেনো একগুচ্ছ প্রহেলিকায় বিহ্বল হয়েছিলেন শাস্ত্রী। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে চর্যাপদের ভাষা পুরোনো বাঙলা। কিন্তু বড়োই রহস্যময়;—কিছুটা বোঝা যায় কিছুটা বোঝা যায় না। তিনি এ-ভাষার নাম দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যাভাষা'। তাঁর মতে, 'সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায় কতক বুঝা যায় না।' তিনি এ-ভাষাকে আলোআঁধারজড়ানো রহস্যময় সন্ধ্যার সাথে তুলনা করেছিলেন। তাঁর উপমার শোভায় আলোড়িত হয়েও কেউকেউ একে আলোআঁধারি ভাষা ব'লে মেনে নেন নি। তাঁদের মতে 'সন্ধ্যাভাষা' হচ্ছে সে-ভাষা, যার অর্থ গভীরভাবে অনুধ্যান ক'রে বুঝতে হয়। অর্থাৎ এ হচ্ছে এক রূপক ভাষা। আমরা প্রতিদিন যে-সব কথা বলি, তাতে কোনো রূপক নেই। আমরা এক কথা ব'লে অন্য কিছু বোঝাতে চাই না। নৌকো বললে নৌকোই বোঝাই, হরিণ বললে হরিণ। গাছ বললে গাছ বোঝাই, নদী বললে নদী। কিন্তু ওই কবিরা বলতেন নৌকো, বোঝাতেন অন্য কিছু; বলতেন গাছ, বোঝাতেন শরীর। তাই এ-ভাষা রূপক, রহস্যময়, বোঝা-না-বোঝার মেঘরোদজড়ানো। একটি পদ পড়া যাক :

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥ধ্রু॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্নকপালি জোই লাঙ্গ ॥ধ্রু॥
এক সো পদমা চৌসঠী পাখড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥ধ্রু॥
আলো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ ॥ধ্রু॥
তান্তি বিকণহ ডোম্বী অবরনা চঙ্গতা।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়এড্ডা ॥ধ্রু॥
তু লো ডোম্বী হাউ কপালী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী ॥ধ্রু॥
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমী পরাণ ॥ধ্রু॥

এটি কবি কাহ্নপাদের একটি পদ। পুরোনো বাঙলা ভাষায় পণ্ডিত নন এমন কারো পক্ষেই এটি পরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়। পণ্ডিতেরাও যে সবাই একইভাবে পদটি বোঝেন, তাও নয়। তাঁদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম মত। যেমন প্রথম পংক্তির 'বাহিরেঁ' শব্দটি কারো মতে 'বারিহিরেঁ', কারো মতে 'বাহিরিরেঁ'। এমন মতভেদ আছে পদটির বেশ কয়েকটি শব্দ সম্পর্কেই। আর অর্থ সম্পর্কে তো মতভেদ বেশ প্রকাণ্ড। তারপর আছে পদটির রূপকার্থ—সে-অর্থ যা শুধু শব্দের অর্থে ধরা পড়ে না। আধুনিক বাঙলায় অনুবাদ করলে পদটি নেবে এমন রূপ :

নগরের বাইরে, ডোম্বী, তোমার কুঁড়েঘর।
তুমি ব্রাহ্মণ নেড়াকে ছুঁয়েছুঁয়ে যাও।
ওগো ডোম্বী আমি তোমাকে বিয়ে করবো।
আমি ঘৃণাহীন কাহ্ন—কাপালিক, যোগী ও উলঙ্গ।
একটি সে পদ্ম, তার চৌষট্টি পাপড়ি।
তাতে চ'ড়ে নাচে ডোম্বী বেচারী।
ওগো ডোম্বী তোমাকে সদভাবে জিজ্ঞেস করি।
কার নৌকোয় তুমি আসা-যাওয়া করো?
ডোম্বী তুমি তাঁত আর চাঙ্গারি বিক্রি করো।
তোমার জন্যে ছাড়লাম নটসজ্জা।
তুমি তো ডোম্বী আর আমি কাপালিক।
সরোবর ভেঙে ডোম্বী তুমি মৃণাল খাও।
তোমার জন্যেই আমি নিয়েছি হাড়ের মালা।
আমি ডোম্বীকে মারি, প্রাণ নিই।

আধুনিক অনুবাদে হয়তো বোঝা যাচ্ছে কথাগুলো। কিন্তু তার ভেতরের ভাব ধরা পড়ছে না। তাই হেঁয়ালি, বলবো কী চমৎকার হেঁয়ালির, মতো মনে হচ্ছে কথাগুলো।

চর্যাপদের ভাষা যে বাঙলা তা পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন এ-ভাষার ব্যাকরণ তন্নতন্ন ক'রে ঘেঁটে। তবে অন্যরাও, যেমন হিন্দিভাষী, মৈথিলিভাষী, ওড়িয়াভাষীরাও, দাবি করেছে চর্যার ভাষাকে নিজেদের ভাষা ব'লে। এমন দাবির কারণ দশম-দ্বাদশ শতকে বাঙলা-হিন্দি-ওড়িয়া ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবে জন্ম নিচ্ছিলো, আর তাদের মাতৃভাষার মধ্যে মিল ছিলো খুবই। আসামি ভাষা ও বাঙলার মধ্যে তো ঘনিষ্ঠ মিল ছিলো ষোলো শতক পর্যন্ত। চর্যাপদের ভাষাকে যে আমরা বাঙলার আদিরূপ ব'লে মানি, তার কারণ এ-ভাষার সাথে পরবর্তী কালের বাঙলা ভাষার মিল খুবই গভীর। ওই মিল আকস্মিক হ'তে পারে না। চর্যাপদের শব্দরাশির বহু শব্দ এখন আর আমরা ব্যবহার করি না। আর প্রায় সমস্ত শব্দেরই রূপ বদলে গেছে এক হাজার বছরে। তবু আদি বাঙলা ভাষা ও আধুনিক বাঙলা ভাষার রক্তের সম্পর্ক নষ্ট হয় নি। সম্পর্কটা ধরা পড়ে চর্যাপদের ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করলেই। ব্যাকরণ ব্যাপারটি বেশ ভয়ানক; তবুও দু-একটি জিনিশ সাহস ক'রে দেখে নেয়া ভালো।

আধুনিক বাঙলায় আমরা সম্বন্ধপদে অর্থাৎ অধিকার বা সম্বন্ধ বোঝানোর জন্যে বিশেষ্য, সর্বনাম ইত্যাদির সাথে যোগ করি 'র', 'এর'। বলি : 'আমার আকাশ', 'কবির কবিতা', 'মায়ের মন'। চর্যাপদের বাঙলায়ও পাওয়া যায় 'এর', 'অর'। কবি কুক্কুরীপাদ লিখেছেন : 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ', অর্থাৎ 'গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়'। কবি ভুসুকুপাদ লিখেছেন : 'হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী'। এর অর্থ হলো : 'হরিণ জানে না হরিণীর ঘর।' 'রুখের তেন্তলি', 'হরিণির নিঅল' প্রভৃতি পদে যে-চিহ্ন দেখি, তা পাওয়া যায় আধুনিক বাঙলা ভাষায়ও। ক্রিয়ার কাল প্রকাশের রীতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম। যখন বলি : 'স্মিতা খাচ্ছে', তখন স্মিতার খাওয়ার ক্রিয়াটি বর্তমান কালে ঘটছে ব'লে বোঝায়। যদি বলি : 'স্মিতা খাবে', তখন ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে ঘটবে ব'লে বোঝায়। আর যদি বলি : স্মিতা খেলো', তখন বোঝায় যে খাওয়ার ক্রিয়াটি একটু আগে শেষ হয়েছে। সাধু বাঙলায় ক্রিয়ার অতীত কাল বোঝানোর জন্যে ক্রিয়ামূলের সাথে 'ইল' যোগ করা হয়। যেমন : 'লক্ষ্মণ কহিল', 'তাহারা আসিল', 'চোরে নিল'। কবি কুক্কুরীপাদ একটি আবেগাতুর বউর কথা লিখেছেন, যে রাতে জেগে থাকে, অথচ বিস্ময়করভাবে তার কানের দুল চুরি হয়ে যায়। তিনি বলেছেন : 'কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅই।' অর্থাৎ তাঁর কানেট নিলো চোরে এখন সে তা কোথায় খুঁজবে? ভবিষ্যৎকালে সাধুভাষায় ক্রিয়ামূলের সাথে যোগ করা হয় 'ইব'। যেমন : 'আমি করিব', 'আমি নাচিব'। চর্যাপদের ভাষায়ও তা দেখা যায়। কাহ্নপাদ লিখেছেন : 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ', অর্থাৎ সাক্ষী করবো জালন্ধরিপাদকে। এভাবে খুঁজেখুঁজে পাই আধুনিক বাঙলার সাথে হাজার বছর আগের বাঙলার সম্পর্ক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যাপদের কিছু শব্দ, যেগুলোকে অদ্ভুত মনে হয় আমাদের কাছে, তুলে দিচ্ছি এখানে। বন্ধনির ভেতরে দেয়া হলো অর্থ। অকিলেসেঁ (অক্লেশে : বিনা পরিশ্রমে), অচ্ছহুঁ (আছি), অদ্ভূঅ (অদ্ভুত), অবণাগবন (আনাগোনা), আইলেসি (এসেছে), উইএ (উদিত হয়), উএস (উপদেশ), উঞ্চা উঞ্চা (উঁচু উঁচু), করুণা নাবী (করুণা নৌকো), কল-এল-সাদেঁ (কলকল শব্দ), কাআবাকচিঅ (কায়বাকচিত্ত), কেডুআল (দাঁড়), গঅণ (আকাশ), গুহাড়া (অনুরোধ), ঘলিলি (নিলাম), চউকোড়ি (চোর কোটি), ছুপই (ছোঁই), জাণহুঁ (জানি), জোহা (জ্যোৎস্না), ণাণা (নানা), ণাবড়ি-খণ্ডি (ছোট নৌকো), তংত্রী (তন্ত্রি), তিঅধাউ (তিন ধাতু), দুলি (কচ্ছপ), নঅ বল (দাবা খেলা), নঈ (নদী), নাচঅ (নাচে), নাবী (নৌকো), পঁউআ-খালে (পদ্মার খালে), পিবই (পান করে), পীছ (পুচ্ছ), বিআলী (বিকেল), বেন্টে (বাঁটে), ভণই (বলে), মরণঅণা (মরণ ও জীবন), মহাসুহ (মহাসুখ), রুখের (গাছের), ষবসলী (অতিদুঃখ), ষামায় (ঢোকে), সাসু ঘরেঁ (শাশুড়ীর ঘরে), হাউঁ (আমি), হিঅহি (হৃদয়ে), হিণ্ডই (ঘুরে বেড়ায়), হোহু (হও)।

চর্যাপদের গানগুলোতে খচিত হয়ে আছে আদিযুগের বাঙলা ভাষার পরিচয়। চর্যাপদের বাইরে পুরোনো বাঙলা ভাষার কিছু শব্দ পাওয়া গেছে আরেকটি গ্রন্থে। ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন সংস্কৃত অভিধান *অমরকোষ*-এর টীকা। ওই টীকার নাম *টীকাসর্বস্ব*। সংস্কৃত অভিধানের বাঙালি টীকাকার সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছিলেন তিনশোর মতো দেশি শব্দ। তাঁর টীকায় পাওয়া যায় ফড়িঙ্গ (ফড়িং), ডাশ (ডাঁশ), ডাঢ়কাক (দাঁড়কাক), বেঙ্গ (ব্যাঙ), চাল (চাল), টোপর (টোপর), সিঙ্কল (শেকল) প্রভৃতি শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালিন্দীর কূলে বাঁশি বাজে

কালিন্দীর কূলে বাঁশি বেজে উঠলো। বাঁশি বেজে উঠলো গোঠ গোকুলে। তার সুরে কেঁদে উঠলো একটি মেয়ে। রাধা। সে তীনভুবনজনমোহিনী। শিরীষকুসুমকোঁআলী। অদ্ভুত কনকপুতলী। তার রূপে মুগ্ধ হয় তিন ভুবনের অধিবাসীরা। শিরীষকুসুমের মতো কোমল সে। রাধা এক অদ্ভুত—আগে কখনো দেখা যায় নি এমন—সোনার প্রতিমা। সে-রাধার কান্নার সুরে বাঁধা প'ড়ে আছে মধ্যযুগের প্রথম দিকের বাঙলা ভাষা।

যেমন আদি বাঙলা ভাষার রূপের কথা কেউ জানতো না মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "চর্যাপদ" আবিষ্কারের আগে, তেমনি মধ্যযুগের শুরুতে কেমন রূপ ছিলো বাঙলা ভাষার, তাও জানতো না কেউ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামের একটি পুথি আবিষ্কারের আগে। পুথিখানি ছিলো বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বহু শতাব্দী ধ'রে অনাদরে চোখের আড়ালে প'ড়ে ছিলো সোনার স্তূপের চেয়েও দামি এ-পুথিটি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ওই বাড়িতে উদ্দেশ পান পুথিটির। বলা যেতে পারে আবিষ্কার করেন তিনি পুথিটি। এর দু-বছর আগে বাঙলা ভাষার পুরোনো রূপ নেপালে আবিষ্কার করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন বাঙলা ভাষার মধ্যযুগের সূচনাকালের রূপ। তাই অমরতা জুটেছে তাঁরও ভাগ্যে।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে ১৯১৬ একটি সোনার বছর। ওই বছরই বেরোয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত *হাজার বছরের পূরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা,* অর্থাৎ "চর্যাপদ"। বাঙালি দেখতে পায় তার মাতৃভাষার আদি চেহারা। আর ওই বছরেই বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" বহু কবির লেখা কাব্য নয়। এটি একজন কবির লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বড়ো কাহিনীকাব্য। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটির "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নাম কবি দেন নি, দিয়েছেন সম্পাদক। কাব্য হিশেবে অতুলনীয় ও অসামান্য "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। কবি বড়ু চণ্ডীদাস বাঙলা ভাষার প্রথম মহাকবি।

কখন জীবিত ছিলেন মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস? কখন লিখেছিলেন তিনি এ-কাব্য? কবি ও কাব্যের কাল সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে অনেক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন লিপিবিদ। তিনি পুথিটির লিপি পরীক্ষা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন যে কাব্যটি ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগে—সম্ভবত চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে—রচিত হয়েছিলো। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন যে চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রচিত হয়েছিলো বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এমনই মনে করেন। তিনি মনে করেন পঞ্চদশ শতকের সূচনার আগেই, অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত হয়েছিলো কাব্যটি। এখন মনে করা হয় ১৩৫০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে এটি রচিত হয়েছিলো। এটির ভাষায় ওই কালের চিহ্ন আছে। তাই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই মধ্যযুগের সূচনাকালের বাঙলা ভাষার রূপ। বাঙলা ভাষার ওই কালের এমন বিশ্বস্ত রূপ আর কোনো রচনায় পাওয়া যায় না।

"চর্যাপদ"-এ পাই দশম থেকে দ্বাদশ শতকের বাঙলা ভাষা। শৈশবের বাঙলা ভাষা। জন্মকালের বাঙলা ভাষা। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই চোদ্দ শতকের শেষ দিকের বাঙলা ভাষা। মধ্যযুগের শুরুর কালের বাঙলা ভাষা। কিন্তু এর মাঝে যে কেটে গেছে দেড় শো বছর, ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টীয় অব্দ। কোথায় গেল ওই দেড় শো বছরের বাঙলা ভাষা? এক নয়, দুই নয়, দশ নয়, দেড় শো বছর। ওই সময় কি ছিলো না বাঙলা ভাষা? তা তো হ'তে পারে না। আগে আছে, পরেও আছে, মাঝখানে ভাষার এ-ফাঁক তো বিস্ময়কর। এ নিয়ে বিস্মিত থাকতে হবে বাঙালিকে চিরকাল। ওই সময় বাঙালি ছিলো, ছিলো বাঙলা ভাষা। কিন্তু তা মিশে গেছে আকাশেবাতাসে। তার লিখিত নমুনা নষ্ট হয়ে গেছে। এ-জন্যে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এ-সময়টাকে, ১২০০ থেকে ১৩৫০-এর কালকে, বলা হয় অন্ধকার যুগ। কখনো বলা হয় ক্রান্তিকাল। ওই সময়ে বাঙলা ভাষার বিশ্বস্ত নমুনা পাই না। তাই যেই পাই "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন", উৎফুল্ল হয়ে উঠি আনন্দে। কেননা "চর্যাপদ"-এর ভাষার দেড় শো বছর পরের বাঙলা ভাষার রূপ এতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ওই ফাঁকটা পুরবে না কখনো, বুঝতে পারবো না কীভাবে দেড় শো বছর ধ'রে বদলিয়েছিলো বাঙলা। কিন্তু যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" পাই, বুঝি বদলে গেছে বাঙলা ভাষা। রক্তের সম্পর্ক আছে তার সাথে "চর্যাপদ"-এর ভাষার, আছে রূপের সম্বন্ধ। কিন্তু তা বেশ দূরের।

নদীর পারে বাঁশির সুরের মতো নরম, বুক থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো কোমল "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর ভাষা। সোনার প্রতিমা রাধা এ-কাব্যে অনেক কেঁদেছে। তার চোখের জলের দাগ লেগে আছে এর ভাষায়। রাধা যেমন শিরীষ ফুলের মতো, এর ভাষাও তেমনি। আজকাল এর বেশকিছু শব্দ অচেনা হয়ে গেছে আমাদের কাছে, কিন্তু তা আমাদের বেশি কষ্ট দেয় না। "চর্যাপদ"-এর ধাঁধা আর প্রহেলিকা নেই, নেই কর্কশতা। "চর্যাপদ"-এর কবিরা 'এবংকার দিঢ় বাখোড় মোড়িউ' ব'লে গর্জন করেন, 'বিবিহ বিআপক বান্ধণ তোড়িউ' ব'লে ভেঙেচুরে ফেলেন সব বাধা। অনেক কষ্ট ক'রে বুঝি যে কবি ভেঙে ফেলেছেন দিনরাত্রির বন্ধনস্তম্ভ, চুরমার করেছেন বিবিধ ব্যাপক শৃঙ্খল। তাঁর ওই ভাষা না বুঝে শুধু ধ্বনি শুনেই বুঝি যে চিৎকার ক'রে উঠেছেন এক কর্কশ তান্ত্রিক। ভয় লাগে ওই তান্ত্রিকের চেহারা ভেবে। মন কেঁপে ওঠে তাঁর কথা শুনে। কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ কোথাও ওড়ে রাধার নীল শাড়ি, কোথাও মুক্তোর মতো ঝিলিক দেয় তার অশ্রু। কোথাও তার নিশ্বাসে ভিজে ওঠে মাঠঘাট। তার কান্নায় কেঁদে ওঠে নীল হয়ে যমুনার ঢেউ। "চর্যাপদ"-এর ভাষা পদ্মার গর্জন। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর ভাষা যমুনার কলতান।

বুঝতে খুব কষ্ট হয় না এ-ভাষা। রাধা যখন বলে, 'আল বড়ায়ি। এগার বৎসরের বালী। যেহ্ন নলিনীদল কোঁঅলী।' তখন গুণগুণ সুর শুনি। বুঝি সে বলছে, 'ওগো বড়ায়ি, আমি এগারো বছরের বালিকা। যেনো পদ্মদলের মতো কোমল।' কৃষ্ণ যখন বলে, 'মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে। নয়ন তোর নীল উতপলে। মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের যুতী।' তখন বুঝি কৃষ্ণ খুব মুগ্ধ হয়েছে রাধার সৌন্দর্যে। কেননা মুখ তার ফোটা পদ্ম। মাণিক্যের চেয়েও সুন্দর তার দন্তপংক্তি। কৃষ্ণ বলে, 'রাধাকে না পাআঁ বেআকুল মনে।' এ-কাব্যে 'এবেঁ মলয় পবন ধীরে বহে'। 'সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ।' কৃষ্ণ চ'লে যাওয়ার পর রাধাকে 'দিনের সূরুজ পোড়াআঁ মারে রাতিহো এ দুখ চান্দে।' দিনের সূর্য তাকে দহন করে, রাতে দুঃখ দেয় চাঁদ। তারপর আসে 'মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশি'। মেঘে অন্ধকার ভয়ঙ্কর রাত। একা কদমতলায় ব'সে কাঁদে রাধা। 'একসরী ঝুরো মো কদমতলে বসী।' আর তখন 'মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ। বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ।' ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে দূর থেকে দূরে। কিন্তু কাঁদে রাধা। তার কান্নার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরে তার চোখের জলে টলমল করতে থাকে মধ্যযুগের শুরুর সময়ের কোমল-মধুর বাঙলা ভাষা। এ-কাব্যের একটি আকুলব্যাকুল পদ এমন :

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ধ্রু॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
অঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী।
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর একটি সর্গের নাম 'বংশীখণ্ড'। এটি 'বংশীখণ্ড'-এর দ্বিতীয় পদ। ভাষা এর কঠিন নয়। এখানে সেখানে একটুআধটু বদল করলে, বানান আধুনিক করলে এ-ভাষা আমাদের কালের ভাষা হয়ে ওঠে। এর কান্নায়, এর বেদনায় সহজেই সাড়া দেয় আমাদের চিত্ত। আধুনিক বাঙলায় এ-পদটি হবে এমন :

কে বাঁশি বাজায় বড়ায়ি কালিন্দী (যমুনা) নদীর কূলে?
কে বাঁশি বাজায় বড়ায়ি এ-গোঠ গোকুলে (যমুনা পারের গ্রামে)?
আমার শরীর আকুল আর মন ব্যাকুল।
বাঁশির সুরে আমি রান্না এলোমেলো ক'রে ফেললাম।
কে বাঁশি বাজায় বড়ায়ি, কে সে জন?
দাসী হ'য়ে তার পায়ে নিজেকে সঁপে দেবো।
কে বাঁশি বাজায়, বড়ায়ি, মনের আনন্দে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার কাছে, বড়ায়ি, আমি কী দোষ করেছি?
আমার চোখের পানি ঝরে অজস্র ধারায়।
বাঁশির সুরে আমি প্রাণ হারালাম।
আমার মন আকুল করার জন্যে কি
মধুর সুরের বাঁশি বাজাচ্ছে কৃষ্ণ?
আমি পাখি নই যে তার কাছে উড়ে যাবো।
মাটি দু-ভাগ হও, আমি প্রবেশ ক'রে লুকোবো।
আগুনে বন পুড়লে বড়ায়ি সকলেই জানে।
আমার মন পোড়ে কুমোরের পোআনের মতো।
কৃষ্ণের অনুরাগে আমার মন সুখ পায়।
বাশলীর বন্দনা ক'রে গাইল চণ্ডীদাস।

এ-অনুবাদে অর্থ হয়তো কিছুটা বেশি স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু মুছে গেছে রাধার অশ্রু, থেমে গেছে বাঁশির সুর, স্তব্ধ হ'য়ে গেছে যমুনার পার ব্যাকুল-করা রাধার আকুলতা।

"চর্যাপদ"-এর ভাষা নিয়ে বিতর্ক আছে। অন্যরাও—যেমন হিন্দি, মৈথিলি, ওড়িয়াভাষীরা—দাবি করেছেন "চর্যাপদ"-এর ভাষাকে নিজেদের ভাষা ব'লে। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নিয়ে অমন তর্কের সুযোগই নেই। এর ভাষা বাঙলা; এবং শুধুই বাঙলা। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর অধিকাংশ শব্দই প্রাকৃত ও প্রাকৃতজাত। ওই শব্দরাশির একটি বড়ো অংশ এখনো বাঙলা ভাষায় চলে। প্রচুর 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে এর বানানে, আর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) পাওয়া যায় এখানেসেখানে। এতে বেশকিছু অনার্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো সংস্কৃত শব্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অনেক শতক ধ'রে আছে ব'লে সেগুলোকে সংস্কৃত শব্দ ব'লেই মনে হয়। নীর, পূজা, মলয়, মীন, মুকুট, কদলী, গঙ্গা, ডুমুর, তাম্বল, নারিকেল প্রভৃতি এমন শব্দ। বইটিতে কয়েকটি আরবিফারসি শব্দও পাওয়া গেছে। যেমন : কামান, মজুরি, মজুরিআ, খুরমূজা, বাকী, মিনতি প্রভৃতি শব্দ।

আধুনিক বাঙলায় বাক্যের কর্তা পুরুষ বা স্ত্রী, যাই হোক, তাতে ক্রিয়ার রূপে কোনো পার্থক্য ঘটে না। আমরা বলি, 'ছেলেটি গেলো', 'মেয়েটি গেলো'। দু-বাক্যই 'গেলো'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ অনেক জায়গায় দেখা যায় বাক্যের কর্তা যদি স্ত্রী হয়, তাহলে ক্রিয়াও স্ত্রী-রূপ ধরে। পাওয়া যায় 'গেলী রাহী', 'বড়ায়ি চলিলী', 'কোপে গরজিলী রাধা'র মতো প্রয়োগ।

আধুনিক বাঙলায় বহুবচন করা হয় সাধারণত 'রা', 'এরা', 'দের', 'গুলো' প্রভৃতি যোগ ক'রে। বহুবচনের চিহ্নরূপে 'রা'র প্রয়োগ ঘটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এই প্রথম। পাওয়া যায় 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী', 'পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে'র মতো প্রয়োগ। তবে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" –এ সমষ্টিবাচক শব্দ—'সব', 'গণ', 'জন' প্রভৃতি—দিয়েই বহুবচন প্রকাশ করা হয়েছে বেশি। যেমন : 'তোহ্মে সব', 'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ', 'এসব গোপবধূজন লআঁ কথাঁ না যাসি বড়ায়ি', 'আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ'।

ক্রিয়ার খুব মজার মজার রূপ পাওয়া যায় এ-কাব্যে। এখন আমরা শুধু ক্রিয়ার সাথে 'ই' যোগ ক'রে যা কিছু বোঝাই, এ-কাব্যে তা বোঝানোর জন্যে ক্রিয়ার সাথে কখনো কখনো 'অওঁ, কখনো 'ও', বা 'ওঁ', কখনো 'ই' বা 'ঈ', কখনো 'ইএ' যোগ করা হতো। যেমন : 'যবেঁ আন করোঁ', 'নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে', 'আহ্মে জাইএ দধি বিকে', আহ্মে করিবাক পারী'।

এখন বাঙলায় যেখানে 'লাম' বসে এ-কাব্যে সেখানে পাওয়া যায় 'লোঁ' বা 'লো', কখনো 'লাহোঁ, কখনো 'ল', কখনো 'ই'। কৃষ্ণ বলছে, 'হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে', 'অর্থাৎ হাতে তুলে আমি বিষ খেলাম'। রাধা বলছে, 'পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহান হাথে', অর্থাৎ 'আবার তার হাতে পড়লাম'। কৃষ্ণ গর্ব করছে এমনভাবে : 'মেদনী ধরিল আহ্মে দশনের আগে', অর্থাৎ 'দাঁত দিয়ে আমি পৃথিবীকে ধরলাম'। এখন ভবিষ্যৎ বোঝানোর জন্যে যেখানে 'বো' ব্যবহার করি, এ-কাব্যে সেখানে বসেছে 'বোঁ', কখনো 'বওঁ, কখনো 'ব', কখনো 'মো'। রাগেঅভিমানে যখন রাধা বাহুর বলয় চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়, তখন সে বলে, 'বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর।' বাহুর বলয় আমি চূর্ণবিচূর্ণ করবো। অভিমানে অপমানে যখন আর বেঁচে থাকতেও চায় না, তখন রাধা বলে : 'দিবওঁ পরাণ মোঁ করিব আত্মঘাতী।' আমি প্রাণ দেবো, আত্মহত্যা করবো।

কালিন্দীর কূলে বাঁশি বেজে উঠেছিলো ছ-শো বছর আগে। সে-বাঁশির সুর "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"। তাতে চিরকালের জন্যে বাঁধা প'ড়ে আছে বাঙলা ভাষার মধ্যযুগের সূচনাকালের রূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর ধ'রে

কালের কুয়াশা ঘেরা এক সময়ে মাগধী প্রাকৃতের বুক থেকে উদ্ভূত হয়েছিলো বাঙলা ভাষা। তারপর কেটে গেছে হাজার বছর। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জন্মেছে বাঙালি, মিশে গেছে প্রকৃতির সাথে। কতো রাজা এসেছে আর মিশে গেছে আগুনে মাটিতে। নানাভাবে রূপ বদল ঘটেছে বাঙালির মাতৃভূমির। এসব নশ্বরতার মধ্যে শুধু অবিনশ্বর হয়ে আছে বাঙলা ভাষা। অবশ্য বাঙলা ভাষা বলতে একটি অনন্য বাঙলা ভাষা বোঝা ঠিক হবে না। বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে বাঙালিরা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন রকম বাঙলা ভাষা। কিন্তু তাদের মধ্যে ছিলো আন্তর মিল। তারা একই বাঙলা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। বা বলা যেতে পারে বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ থেকে আধুনিক কালে জন্ম নিয়েছে এক সর্বজনীয় বাঙলা ভাষা। হাজার বছরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে মানুষ, রাজাবাদশাহ। বদলে গেছে দেশের আকৃতি। কিন্তু টিকে আছে বাঙালির ভাষা। তার কণ্ঠস্বর। বাঙলা ভাষা।

কিন্তু কিছুই চিরস্থির অবিনশ্বর নয় পৃথিবীতে। বাঙলা ভাষাও নয়। হাজার বছরে পৃথিবীর কতো ভাষা ম'রে গেছে, হারিয়ে গেছে। বহু ভাষা শুধু লাশের মতো রক্ষিত হয়ে আছে কাগজের কফিনে। কোথায় আজ ভাষার রাজারা, গ্রিক-লাতিন-সংস্কৃত? কোথায় পালিপ্রাকৃত? ওই সব ভাষা আজ শুধু পণ্ডিতদের আনন্দ। কোনো মানুষের বুক থেকে মুখ থেকে সেগুলো মুখর হয়ে ওঠে না। কিন্তু বাঙলা জীবিত ও জীবন্ত ভাষা, মুখর হয়ে ওঠে বাঙালির মুখ থেকে। বুক থেকে। রক্ত ও অস্তিত্ব থেকে। জন্মের পর কেটে গেছে তারও জীবনের হাজার বছরেরও বেশি সময়। এতো বছর ধ'রে স্থির অবিচল থাকে নি বাঙলা ভাষা। নানাভাবে বদলে গেছে তার রূপ। বদলে গেছে তার স্বর। কালেকালান্তরে নতুন থেকে নতুনতর হয়ে উঠেছে বাঙলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই। "চর্যাপদ"-এ বাঙলা ভাষা ছিলো এমন সুদূর।

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ বাঙলা ভাষা বেশ কাছে এসে গেছে আমাদের।

কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার। যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥ কৃত্তিবাসের "রামায়ণ"-এ (পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ) বাঙলা আরো কাছাকাছি এসে গেছে আমাদের।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলে বাটে। চণ্ডীদাসের পদে বাঙলা ভাষা এমন।

তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিনু উদক পান শিশু কাঁদে ওদনের তরে। মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল"-এ (ষোড়শ শতকের শেষভাগ বা সপ্তদশ শতকের শুরুর দশক) বাঙলা ভাষা এমন।

আমি তো ধর্ম্মো নিন্দা করি না, ধর্ম্মের ধর্ম্মো কহি; অধর্ম্মোরে অধর্ম্মো কহি। দোম আন্তনিয়োর "ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ"-এ (সপ্তদশ শতক) পাই এমন বাঙলা ভাষা।

পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার বলি। দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড বলি। এমন অদ্ভুত বাঙলা পাই আঠারো শতকের একটি রচনায়।

বদলে গেছে বাঙলা ভাষা। নানা রূপে। নানা সুরে। স্বরব্যঞ্জনে। বিশেষ্যবিশেষণে। সর্বনামে ক্রিয়ারূপে।

এখন যে-ধ্বনিগুলো আছে বাঙলা ভাষায়, সেগুলো এখন যেভাবে উচ্চারণ করি, হাজার বছর আগে সেগুলো অবিকল এমনভাবে উচ্চারিত হতো না। একেবারে ভিন্নভাবে যে উচ্চারিত হতো, তাও নয়। প্রত্যেক যুগের মানুষ একইভাবে তাদের ভাষার ধ্বনি উচ্চারণ করে না। বাঙালিরাও করে নি। তাতেই বদলে গেছে বাঙলা ভাষার ধ্বনি। পরিবর্তিত হয়ে গেছে শব্দের রূপ। হাজার বছর আগে যে-সব শব্দ ব্যবহার করতো বাঙালিরা, সেগুলোর সব আমরা ব্যবহার করি না। অনেক শব্দ ব্যবহার করি অন্যরূপে। রূপ বদলে গেছে। বিশেষ্যর বিশেষণের। ক্রিয়ার রূপ বদলে গেছে। অনেক শব্দের অর্থ বদলে গেছে। ম'রে গেছে বহু শব্দ। জন্ম নিয়েছে অনেক নতুন শব্দ। বিদেশি ভাষা থেকে শব্দ ঋণ করেছি অনেক। তাই হাজার বছরে অনেকখানি বদলে গেছে বাঙলা ভাষার শরীর। কথা বলতে হয় বাক্যে। বাক্য তৈরির নিয়মে ঘটেছে অনেক বদল। আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বাঙলা ভাষা প্রবেশ করছে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপ বারবার বদল ক'রে। তাতে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায় নি। নদীর মতো এগিয়েছে সামনের দিকে। নদীর উৎস থেকে মোহানা অনেক দূর, আর অনেক ভিন্ন। ঠিক তেমনি অনেক দূর আর ভিন্ন বাঙলা ভাষার উৎস ও মোহানা। কতোটা সুদূর, কতোটা ভিন্ন? তার কিছু পরিচয় নেয়া যাক এবার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বনিবদলের কথা

বাঙলার মূলে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। তাতে অনেকগুলো ধ্বনি ছিলো। স্বরধ্বনি ছিলো : অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও , ঔ। ছিলো অনেকগুলো ব্যঞ্জনধ্বনি : ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ৱ [মূর্ধণ্য-ল], ল্হ [মহাপ্রাণ-ল], ৰ [অন্তঃস্থ ব], শ, ষ, স, হ, ং, ঃ। এ-ধ্বনিগুলোই আছে বাঙলা ভাষায়। তবে সবগুলো নেই। এগুলোর কয়েকটি লোপ পেয়েছে বাঙলা থেকে। আবার কয়েকটি জন্ম নিয়েছে বাঙলা ভাষায়। এগুলো প্রাচীনকালে পৃথকভাবে যেভাবে উচ্চারিত হতো, এখন বাঙলায় তেমন হয় না। আদিযুগের বাঙলায় হয়তো হতো। ধ্বনি মিলে গ'ড়ে ওঠে শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাঙলা পর্যন্ত আসতে শব্দে ধ্বনির বিন্যাস ও উচ্চারণ বদলে গেছে নানাভাবে। তাতে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়েছে, শব্দ ভিন্ন চেহারা পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আদি বাঙলা ভাষায় ধ্বনির পরিবর্তন, আর আদি বাঙলা থেকে আধুনিক বাঙলায় ধ্বনির পরিবর্তনের ইতিহাস খুবই জটিল। এখন সব বলা যাবে না। শুধু কয়েকটির কথা বলি।

বাঙলা ভাষার প্রথম ধ্বনি 'অ'। হাজার বছর আগে, "চর্যাপদ"-এ এই 'অ' অবিকল এমন ছিলো না। উচ্চারণ আজকের উচ্চারণের মতো ছিলো না। খুব সহজে বলা যায় তখন 'অ' ছিলো অনেকটা আজকের 'আ'-র অনেক কাছাকাছি। আমরা এখন 'ই'-কে বলি হ্রস্ব-ই, আর 'ঈ'-কে বলি দীর্ঘ-ঈ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় 'অ' ছিলো হ্রস্ব-আ। পুরোনো বাঙলা ভাষায়ও অনেকটা তাই ছিলো।

এই 'অ' যে অনেকটা 'আ'-র কাছাকাছি ছিলো, তার প্রমাণ পাই "চর্যাপদ"-এ। "চর্যাপদ"-এর বিভিন্ন শব্দের আদিতে যেখানে জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে, সেখানেই মাঝেমাঝে বিপর্যয় ঘটেছে 'অ' এবং 'আ'-র। পাওয়া যায় 'অইস' আর 'আইস'; 'কবালী' আর 'কাবালী', 'সমাঅ' আর 'সামাঅ' প্রভৃতি শব্দ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এও 'অ' অনেকটা 'আ'-র মতোই ছিলো। তাই পাই 'আকারণ', 'আচেতন', 'আতিশয়', 'আতী' প্রভৃতি শব্দ। উল্লেখ করা ভালো যে আদিযুগে অ-কারান্ত শব্দ অর্থাৎ যে-সব শব্দের শেষে 'অ' আছে সে-সব শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারিত হতো। 'আকারণ' উচ্চারিত হতো 'আকারণঅ', 'আচেতন' উচ্চারিত হতো 'আচেতনঅ'। তাই এখন পুরোনো বাঙলা উচ্চারণ শুনলে আমাদের কেমনকেমন লাগে।

'আ' এখন আছে, চিরকাল ছিলো। "চর্যাপদ"-এ ছিলো। তবে শব্দের শেষে 'আ' শ্বাসঘাত না পেলে পরিণত হয়ে যেতো হ্রস্ব 'অ' ধ্বনিতে। "চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় 'পাণিআ' ও 'পানী', 'করিআ', ও 'করিঅ', 'অমিআ' ও 'অমিঅ' প্রভৃতি একই শব্দের দু-রূপ। এসব উদাহরণে দেখা যাচ্ছে শব্দের শেষের 'আ' লোপ পেয়ে গেছে, বা পরিণত হয়ে গেছে 'অ'-তে।

আধুনিক বাঙলায় বানানেই শুধু পার্থক্য করা হয় 'ই' আর 'ঈ' এবং 'উ' আর 'ঊ'-মধ্যে। উচ্চারণে 'ই' আর 'ঈ', 'উ' আর 'ঊ'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এমন ঘটেছে বাঙলা ভাষার জন্মকাল থেকেই। "চর্যাপদ"-এ হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের কোনো পার্থক্য ছিলো না; পার্থক্য ছিলো না "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ, ও পরে। "চর্যাপদ"-এও পাওয়া যায় 'সবরী' ও 'শবরি', 'জোই' ও 'জোঈ', 'লুই' ও 'লূয়ি' প্রভৃতি শব্দ। এগুলো প্রমাণ করে উচ্চারণে ভিন্নতা ছিলো না 'ই' আর 'ঈ', 'উ' আর 'ঊ'-র মধ্যে। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই 'কাজলে রঞ্জিল দুঈ আখী', 'অমৃতেঁ সিঞ্চিউ দুই আখী', 'মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে', 'মাণিক জিনিআঁ তোর দশন উজলে', 'মণিকিরণ ঊজলে আঙ্গদ ভুজযুগলে' প্রভৃতি উদাহরণ। এগুলোতে দেখা যায় কোনোই পার্থক্য নেই 'ই'/'ঈ', আর 'উ'/'ঊ'-র মধ্যে। পার্থক্য ছিলো না মধ্যযুগে। নেই আধুনিক কালে।

'ঋ' ধ্বনিটি স্বরধ্বনির মধ্যে স্থান পেলেও এটি স্বরধ্বনি নয়। আগের 'ঋ' আদি বাঙলায় পরিণত হয়ে যায় 'উ'-তে। 'ঋজু' শব্দটি "চর্যাপদ"-এ হয়ে গেছে 'উজু'। কবি সরহ বলেছেন, 'বপা উজুবাট ভাইলা'; অর্থাৎ 'বাবা, সোজা পথ দেখা গেলো'।

আরো বহু ব্যাপার ঘটে স্বরধ্বনিরাশিতে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো বাঙলায় আসে কিছুটা বিকল হয়ে।

কয়েকটির কথা বলা যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কাছে দুটি 'ন', 'ণ'। এ-দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। শুরুতেও পার্থক্য ছিলো না। পার্থক্য ছিলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়। কিন্তু "চর্যাপদ", "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ এ-দুটি ধ্বনিত হতো একই রূপে। তাই এ-বই দুটিতে পাওয়া যায় 'ন্' আর 'ণ্'-র যথেচ্ছ ব্যবহার। "চর্যাপদ"-এ পাই 'ণিঅ মণ ণ দে উলাস', অর্থাৎ 'নিজের মন উল্লাস দেয়'; আবার পাই 'নিঅ দেহ করুণা শূন মেহেরী', অর্থাৎ 'নিজ দেহ হলো করুণা ও শূন্য-মহিলা'। তাই দেখি কোনোই ভেদ নেই 'ন' আর 'ণ'-তে। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই 'আঝর ঝরয়ে মোর নয়নের পাণী'। 'পানি' শব্দের বানানে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ কোথাও 'ন' ব্যবহৃত হয় নি। তাই কেউকেউ মনে করেন হয়তো 'ণ'-এর একটি পৃথক উচ্চারণ ছিলো কিন্তু তা থাকার কথা নয়। 'ণাম্বায়িল' ও 'নাম্বায়িল' ধরণের বানান খুব পাওয়া গেছে এ-কাব্যে।

এখন তিনটি 'শ্', 'ষ্', 'স্' আছে আমাদের। "চর্যাপদ", "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর কালেও ছিলো। এখনকার মতোই তিনটিরই প্রধান উচ্চারণ ছিলো 'শ্'। "চর্যাপদ"-এ পাওয়া 'শূণ' ও 'সুণ', 'সহজে' ও 'ষহজে', ও 'মুসা' ও 'মুষা'—মনে হয় উচ্চারণ ছিলো এদের একই। বিভিন্ন শব্দের বানান তখনো স্থির হয় নি ব'লে যেখানেসেখানে বসানো হয়েছে 'শ', 'ষ', 'স' তিনটিকে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই 'শিশের সিন্দুর সুরেখ শোভে আর দশনের যুতী', 'মুছিআঁ পেলায়িবোঁ কড়ায়ি শিষের সিন্দুর', 'সিশের সিন্দুর তোর লাসে'। এতে বুঝি তিন 'শ'-র ভেদ ছিলো না উচ্চারণে।

আমাদের আছে দুটি 'জ' আর 'য'। এদের উচ্চারণের ভেদ নেই। প্রাচীন আর্যভাষায় 'য' উচ্চারিত হতো অনেকটা 'য়'-র মতো। বাঙলায় সে-পুরোনো 'য'-র উচ্চারণ কোথাও 'জ' হয়ে গেছে, কোথাও হয়েছে 'য়'। তাই একটি নতুন অক্ষরই তৈরি করতে হয়েছে আমাদের 'য়'-রূপে। শব্দের শুরুতে 'য' নতুন উচ্চারণ অনুসারে সাধারণত 'জ'-ই উচ্চারিত ও লিখিত হতো। "চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় 'জবেঁ মুষাএর চার তুটআ', 'জে জে আইলা তে তে গেলা', 'গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এও একই রকম ঘটে। পাওয়া যায় 'তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে', 'আজি যখনে মোঁ বাঢ়য়িলোঁ পাএ', 'মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী','বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে'।

আধুনিক বাঙলায় বেশ কিছু মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে। যেমন 'খ্', 'ঘ্', 'ছ্', 'ঝ্' প্রভৃতি। আরো কিছু মহাপ্রাণ ধ্বনি আছে, যেগুলো এখন শুধু লেখায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাদের উচ্চারণ বদলে গেছে। যেমন 'হ্ম', 'হ্ন', 'ঢ়', 'হ্ল' প্রভৃতি। "চর্যাপদ"-এ 'হ্ম', 'হ্ন', 'ঢ়' খাঁটি মহাপ্রাণ রূপেই হয়তো উচ্চারিত হতো। "চর্যাপদ"-এ পাই 'অহ্মে ভলি দান দাহ', 'ভণই কাহ্নু', 'নউ দাঢ়ই নউ তিমই ন ছীজই'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর কাল থেকেই অবশ্য এগুলো মহাপ্রাণতা হারাতে থাকে। তবে এ-কালে 'হ্ম', 'হ্ন', 'ঢ়', 'হ্র', 'হ্ল' মহাপ্রাণ ধ্বনি ছিলো। পাওয়া যায় 'আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার', 'কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী', 'বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ', 'পহ্রাইল হরিষমণে কণ্ঠত ভূষণগণে', 'কনক যূথিকা মাহ্লী লবঙ্গ সেয়তী'। এগুলো এখন শুধুই কয়েকটি শব্দের বানানে পাওয়া যায়। উচ্চারণে পাওয়া যায় না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বনিপরিবর্তন : শব্দের রূপবদল

প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বা বলা যাক সংস্কৃত) ভাষার বহু শব্দ বাঙলায় এসেছে। অনেক শব্দ এসেছে অবিকল, কোনো বদল ঘটে নি তাদের। অনেক শব্দ এসেছে রূপ বদল ক'রে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে মানুষের মুখে ধ্বনি বদলে গেছে ওই শব্দগুলোর। কোনোটির শুরুর স্বরধ্বনি লোপ পেয়েছে। কোনোটিতে পুরোনো স্বরধ্বনি লোপ পেয়ে ধ্বনিত হয়েছে নতুন স্বর। ব্যঞ্জন বদলে গেছে নানাভাবে। বদলে গেছে পুরোনো আর্যভাষার যুক্তব্যঞ্জনের সজ্জা। বদল ঘটেছে প্রাকৃতের যুগে। পরিবর্তন ঘটেছে বাঙলার যুগে। বাঙলা ভাষার উদ্ভবের কালে। পরিবর্তন ঘটেছে বাঙলার মধ্যযুগে। পরিবর্তন ঘটছে এখন। এ-পরিবর্তন ঘটেছে অনেক সময় বেশ নিয়মকানুন মেনে। সূত্রানুসারে। কালিন্দী নদীর কূলে বাঁশি বেজে উঠেছিলো। 'বাঁশি' শব্দটিকে এখনো কেউকেউ লেখেন 'বাঁশী'। বাঙলায় শব্দটি 'বাঁশি' বা 'বাঁশী'। বাঙলা ভাষার আগের যুগ প্রাকৃতের যুগ। তখন শব্দটি ছিলো 'বংসী'। তারও আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগ। তখন শব্দটি ছিলো 'বংশী'। 'বংশী' শব্দটি এখনো বাঙলায় কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। ম'রে যায় নি শব্দটি। কিন্তু এটি থেকে প্রাকৃতে যে 'বংসী' জন্মেছিলো, সেটি ম'রে গেছে। রাতের আকাশের রূপসীর নাম 'চাঁদ'। পুরোনো বাঙলায় শব্দটি ছিলো 'চান্দ'। তারও আগে প্রাকৃতের যুগে ছিলো 'চন্দ'। আর প্রাচীন ভারতীয় আর্যের কালে ছিলো 'চন্দ্র'। 'চন্দ্র' এখনো বাঙলা ভাষায় উজ্জ্বল। কিন্তু 'চাঁদ' আছে বুকের কাছাকাছি।

'চন্দ্র' থেকে 'চাঁদ', আর 'বংশী' থেকে 'বাঁশি' জন্ম নিয়েছে নিয়মকানুন মেনে। এলোমেলোভাবে নয়। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দগুলো নানা রকম নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে, পরিণত হয়েছে প্রাকৃত শব্দে। তারপর আরো ধ্বনিপরিবর্তন ঘটেছে, জন্ম নিয়েছে বাঙলা শব্দ। বাঙলা ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের পর শব্দের ধ্বনিপরিবর্তন থেমে যায় নি, ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘ'টে চলছে। এখনি খুঁজলে বাঙলা ধ্বনিপরিবর্তনের অনেক নিয়ম বের করতে পারি। তবে তাতে যাচ্ছি না। কিন্তু কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্বর আর ব্যঞ্জন বদলে গিয়েছিলো? কী রূপ নিয়েছিলো প্রাকৃতে? কী রূপ নিয়েছে বাঙলায়? তার কয়েকটি নমুনা এখন দেখতে চাই। জানতে চাই কয়েকটি নিয়ম।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যে-সব শব্দে যুক্তব্যঞ্জন (যেমন : ন্ম, দ্য, স্ত প্রভৃতি) ছিলো প্রাকৃতে সেগুলো হয়ে যায় যুগ্মব্যঞ্জন (যেমন : ম্ম, জ্জ, ত্থ, প্রভৃতি), এবং বাঙলায় সেগুলো হয় একক ব্যঞ্জন (যেমন : ম, জ, থ প্রভৃতি)। সাথেসাথে আরো একটি ব্যাপার ঘটে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ও প্রাকৃতে যুক্ত ও যুগ্ম ব্যঞ্জনের আগে যেখানে ছিলো 'অ' বাঙলায় সেখানে হয়ে যায় 'আ'। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বোঝা সহজ হবে।

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
জন্ম	জম্ম	জাম	০
অদ্য	অজ্জ	আজি	আজ
অষ্ট	অট্‌ঠ	আঠ	আট
হস্ত	হত্থ	হাথ	হাত

AMARBOI.COM

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় 'জন্ম' শব্দে 'ন' ও 'ম' যুক্ত ছিলো, 'জ'-র সাথে ছিলো 'অ'। প্রাকৃতে 'ন্ম' হয়ে গেলো যুগ্মব্যঞ্জন 'ম্ম'। বাঙলায় হলো 'ম',—একক ব্যঞ্জন। তবে সাথেসাথে 'জ'-র সাথের 'অ' হয়ে গেলো 'আ'। লেখা হলো 'জা'। 'জন্ম' থেকে পুরোনো বাঙলায় জন্মেছিলো 'জাম' শব্দটি। তবে শব্দটি প্রমাণ করেছে যে জন্মিলে মরিতে হয়—আধুনিক বাঙলায় শব্দটি আর নেই। গোপনে অনেক আগে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে শব্দটি। কিন্তু

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় :

গেলী জাম বহুড়ই কইসে। জনমভর গেলাম, ফিরে আসে কিসে।

ডোম্বি বিবাহিআ আহারিউ জাম। ডোম্বীকে বিয়ে ক'রে জন্ম আহার করলাম।

জাম মরণ ভব কইসণ হোই। জন্ম-মরণ-ভব কী ক'রে হয়।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় 'হাথ':

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে। তাকে লআঁ জাই আম্মে রাধিকার থানে ॥ আমার হাতে কিছু ফুলপান দাও। তা নিয়ে আমি রাধিকার কাছে যাই।

হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে। হাতে সে লগুড় বাঁশি আনন্দে বাজায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অনেক আদিস্বর বাঙলায় লোপ পেয়েছে; যেমন :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
অতসী	তসী	০	তিসি
উডুম্বর	ডুম্বর	০	ডুমুর
অরিষ্ট	রিট্‌ঠ	০	রিঠা
অলাবু	০	০	লাউ

শব্দ শুরুর 'ঋ' বাঙলায় বদলে গেছে নানাভাবে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দের শুরুর একলা বা ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত 'ঋ' কোথাও 'অ' কোথাও 'ই' কোথাও 'উ' হয়ে গেছে বাঙলায়। যেমন :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
ঘৃত	ঘিঅ	ঘী	ঘি
বৃক্ষ	রুক্খ	রুখ	০
ঋজু	উজ্জু	উজু	০

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় : 'নঠ হৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী।' নষ্ট হলো ঘোল দুধ আর ঘি।

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়।

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'জে জে উজুবাটে গেলা আনাবাটা ভইলা সোঈ।' যে যে সোজা পথে গেলো তারা আর ফিরে এলো না।

'রুখ' আর 'উজু' আধুনিক বাঙলায় আর নেই।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও প্রাকৃতের বহু শব্দের শুরুতে যেখানে 'অ' ছিলো, শ্বাসাঘাতের ফলে বাঙলায় সেখানে 'আ' হয়ে গেছে। এমন হ'তে শুরু করে বাঙলা ভাষার জন্মের বেশ কিছুকাল পর, মধ্যযুগের শুরু থেকে। যেমন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন/মধ্য বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
অপর	অবর	আঅর	আর
অবিধবা	অবিহবা	আইহ	এয়ো
অভিমন্যু	অহিমণ্ণু	আইহণ	আয়ান
অলক্তক	অলত্তয়	আলতা	আলতা

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"- এ পাওয়া যায় :
আঅর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআঁ গলার। আর কেড়ে নিলো গলার হার।
কুণ্ডল নিলেক আঅর বলয়া। কুণ্ডল আর বলয় নিলো।
চিরকাল জীউ মোর সামী আইহন। চিরকাল জীবিত থাকুক আমার স্বামী অভিমন্যু।

ধ্বনিপরিবর্তনের একটি নিয়মকে বলে নাসিক্যীভবন। বাঙলায় নাসিক্যধ্বনি হচ্ছে ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্। এগুলো উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে কিছুটা বাতাস বেরিয়ে যায়। অনেক শব্দে আগে এ-ধ্বনিগুলো ছিলো, কিন্তু পরে লোপ পেয়ে গেছে। লোপ পেয়েছে কিন্তু তাদের স্মৃতি একেবারে লোপ পায় নি। স্মৃতিস্বরূপ এরা আগের স্বরধ্বনিকে আনুনাসিক ক'রে দিয়েছে; অর্থাৎ ওই স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় বাতাস কিছুটা নাক দিয়ে বেরোয়। বাঙলায় এমন ব্যাপার নির্দেশ করা হয় চন্দ্রবিন্দু [ঁ] দিয়ে। একটি শব্দ ছিলো 'চন্দ্র', যাতে আছে 'ন'। পরে 'ন'-টি লোপ পায়, আগের ধ্বনিটি 'আ' হয়, ও আনুনাসিক হয়। ফলে জন্ম নেয় 'চাঁদ' শব্দটি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বহু শব্দ এভাবে বদলে বাঙলা হয়ে উঠেছে। কয়েকটি উদাহরণ:

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
চন্দ্র	চন্দ	চন্দ, চান্দ	চাঁদ
চম্পক	চম্পঅ	চম্পা, চাম্পা	চাঁপা
বন্ধ্যা	বঞ্ঝ	বাঁঝ	বাঁঝা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝ	সাঁঝ	সাঁঝ, সাঁজ

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।' বলদে প্রসব করলো গাভী বন্ধ্যা।
"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'পিঠা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে।' পাত্র দোহন করা হয় তিন সন্ধ্যা (বেলা)।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'রাহুঞঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার।'
'শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা।' 'আকাশের চান্দ চাহা তাক আণি দিবোঁ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচীন ভারতীয় আর্যশব্দের ব্যঞ্জনধ্বনি নানাভাবে বদলে, কখনো অবিকল কখনো বিকল হয়ে, উপনীত হয়েছে বাঙলায়। একশ্রেণীর ধ্বনিকে বলা হয় স্পর্শধ্বনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দ শুরুর স্পর্শব্যঞ্জনধ্বনি টিকে ছিলো প্রাকৃতে, আর টিকে আছে বাঙলায়ও। কয়েকটি উদাহরণ :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
কর্ণ	কণ্ন	কান	কান
গাবী	গাবী, গাঈ	গবিআ, গাই	গাই
টলতি	টালই	টালিউ	টলে
ফুল্ল	ফুল্ল	ফুল	ফুল
ঠক্কুর	ঠক্কুর	ঠাকুর	ঠাকুর

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ।' কাজ নেই কারণ নেই চাঁদকে টলানো হলো।
"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : মতিএঁ ঠাকুরক পরনেবিত্তা। অবস করিআ ভববল জিতা।' মন্ত্রী দিয়ে রোধ করলাম রাজাকে। নিশ্চিতভাবে জেতা হলো ভববল(দারা)।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'ডালী ভরী ফুল পানে। মোরে পাঠায়িল কাহ্নে।' কৃষ্ণ আমাকে ডালা ভরে ফুল পান পাঠালো।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দের মধ্যে অবস্থিত ক্, গ্, ত্, দ্, ব্, প্রাকৃতে লোপ পেয়েছিলো। তাই 'পাদ' শব্দ প্রাকৃত হয়ে গিয়েছিলো 'পাঅ'; 'মাতা' হয়ে গিয়েছিলো 'মাআ'। বাঙলায়ও তাই হয়েছে। ওইসব ধ্বনি লোপ পেয়ে বাঙলায় জন্ম নিয়েছে নতুন শব্দ। যেমন :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
শাব	ছাঅ	ছাও	ছা
মুকুল	মুউল	মউল	মউল, বৌল
পিবতি	পিঅই	পিয়া, পিয়ে	পিয়া

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : "ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।' নানা তরু মুকুলিত হলো আকাশে লাগলো ডালপালা।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'কুসুমসমূহমধু পিআ মধুমত্ত মধুকরনিকরে মধুর ঝঙ্কারে'। ফুলের মধু খেয়ে মধুমাতাল মৌমাছিরা মধুর ঝঙ্কার তুলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'অবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান।' অবোধ শিশু কৃষ্ণ তুমি দান চাও।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় শব্দমধ্য এসব ব্যঞ্জনের লোপ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক বাঙলায় ব্যঞ্জন-লোপ-পাওয়া শব্দগুলো আমরা পরিহার করি, ব্যবহার করি একেবারে প্রাচীন ভারতীয় আর্য শব্দ। "চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় "ভুঅণ', কিন্তু এখন আমরা বলি 'ভুবন', পাওয়া যায় 'সঅল', কিন্তু আমরা বলি 'সকল'; পাওয়া যায় 'নঈ', কিন্তু আমরা বলি 'নদী'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় 'রআনী', কিন্তু আমরা বলি 'রজনী'; পাওয়া যায় 'কুয়িলী', কিন্তু আমরা বলি 'কোকিল'; পাওয়া যায় 'কৌয়ল', এখন আমরা বলি 'কোমল'। অর্থাৎ ধ্বনিবদল হয়ে প্রাচীন ভারতীয় শব্দ যেমন রূপ পেয়েছিলো বাঙলা ভাষায়, তাদের অনেকগুলোই আমরা ত্যাগ করেছি। ফিরে গেছি পুরোনো ভারতে, খুঁজে এনেছি পুরোনো শব্দ, যেগুলো বেশ অভিজাত। কিন্তু পুরোনো বাঙলার কবিরা ধ্বনিবদলের ফলে জন্ম নেয়া শব্দেই লিখেছিলেন চমৎকার কবিতা :

কাহ্নপাদ গর্ব ক'রেই বলেছেন : 'তিণি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।' তিন ভুবন আমি অবলীলায় পার হয়ে এলাম।

তিনিই আবার বলেছেন : 'তুই লো ডোম্বী সঅল বিটলিউ।' তুমি হে ডোম্বী সব কিছু টলিয়ে দিলে।

চাটিল্লপাদ দেখেছেন তাঁর সামনে : 'ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।' গহীন গম্ভীর ভবনদী তীব্র বেগে ব'য়ে যায়।

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা বলেছে : 'শীতল মনোহর বাঁশী কে না বাএ। ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।' কে বাজায় স্নিগ্ধ মনোহর বাঁশি? ডালে ব'সে যেনো কোকিল ডেকে যায়।

কৃষ্ণ বলছে : 'দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাণী নাহিঁ লাগে রবির কিরণে।'

আরো একটি চমৎকার পরিবর্তন ঘটেছিলো প্রাচীন ভারতীয় ধ্বনির। একরকম ধ্বনিকে বলা হয় মহাপ্রাণধ্বনি। 'প্রাণ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বাতাস, হাওয়া'। যে-সব ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ফুসফুস থেকে একটু বেশি বাতাস বেরোয়, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণধ্বনি । 'খ' একটি মহাপ্রাণধ্বনি, 'ধ' একটি মহাপ্রাণধ্বনি। 'ফ' একটি মহাপ্রাণধ্বনি, 'ভ' একটি মহাপ্রাণধ্বনি। আরো বেশ কিছু মহাপ্রাণধ্বনি আছে বাঙলায়। ছিলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়। অনেকে মনে করেন প্রতিটি মহাপ্রাণধ্বনির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে একটি ক'রে 'হ' আছে। আসলে ওই বেশি বাতাস বা প্রাণটুকুই 'হ'। 'খ'-র ভেতরের বেশি বাতাসটুকু যদি বের ক'রে দেয়া যায়, তবে প'ড়ে থাকে 'ক্'। আবার 'খ্'-এর ভেতরের 'ক্'-টুকুকে যদি বাদ দেয়া যায়, তাহলে থাকে 'হ'। এভাবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাঙলা ভাষায় আসতে আসতে খ্, ঘ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্ প্রভৃতি মহাপ্রাণধ্বনির বেশি বাতাসটুকুই টিকে গিয়েছিলো। তাই এ-ধ্বনিগুলো পুরোনো বাঙলায় পরিণত হয়েছিলো 'হ' ধ্বনিতে। আধুনিক বাঙলায় ওই 'হ'-টুকুও লোপ পেয়েছে। যেমন :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
সখী	সহী	সহি	সই
বিধি	বিহি	বিহি	০
শেফালিকা	সেহালিআ	সিআলি, শেহলী	শিউলি
রাধিকা	রাহিআ	রাহী, রাই	০
রেখা	রেহা	রেহা	০

চণ্ডীদাসের রাধা আকুল হয়ে উঠেছে : 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।'
বিদ্যাপতির রাধা শান্তি পেয়ে বলেছে : 'আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল।' আজ বিধি সদয় হয়েছে আমার প্রতি।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ দেখি দুঃখে : 'লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।' লুটিয়ে লুটিয়ে রাধা কাঁদে।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় : 'এড়ি জাএ গোআলিনী সহী।' গোয়ালিনী সখী এড়িয়ে যায়।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর বৃন্দাবনে বহু ফুল : 'সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর।' শিউলি জবা রেবতী রঙ্গন ফুল।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ কৃষ্ণ রাধাকে ছুঁলে মনে হয় : 'যেহ্ন নিকষত শোভা কনক রেহা।' যেনো কষ্টিপাথরে সোনার দাগ শোভা পায়।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় অনেক শব্দে—শুরুতে, মধ্যে, শেষে—ছিলো যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি। বাঙলা ভাষায় এখনো অনেক শব্দে এমন যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি রয়েছে। যেমন : 'স্পষ্ট' শব্দের 'স্প'-তে যুক্ত 'স্' আর 'প্'; 'ব্যাঘ্র' শব্দের 'ঘ্র'-তে যুক্ত 'ঘ্' আর 'র্'। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার যে-সব শব্দের শুরুতে এমন যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ছিলো, প্রাকৃতে সে-সব শব্দে যুক্তব্যঞ্জন পরিণত হয় একক-ব্যঞ্জনে। অর্থাৎ থাকে একটি ব্যঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে নাকি কষ্ট হয় অনেকের। তাই কষ্ট কমানোর জন্যে যুক্তর বদলে ব্যবহার করে একক-ধ্বনি। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় শব্দগুলোর অনেক যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে বাঙলায় আসতে আসতে হয়ে গেছে একক-ব্যঞ্জন। যেমন :

প্রাভাআ	প্রাকৃত	প্রাচীন বাঙলা	আধুনিক বাঙলা
ব্রাহ্মণ	বম্হণ,	বাম্হণ, বাহ্মণ	বামন, বামুন
হ্রদ	দহ	দহ	০
প্রতিবেশী	পড়িবেসী	পড়বেষী, পড়বেসী	পড়শি
স্নেহ	ণ্ণেহ	নেহা, নেহ	নাই, লাই

"চর্যাপদ"-এ কাহ্নপাদ তিরস্কার করেছেন ডোম্বীকে : 'ছোই ছোই জাসি বাম্হণ নাড়িআ।' তুমি ব্রাহ্মণ নেড়েকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও।
কবি ঢেন্ঢণপাদ দুঃখের সাথে গেয়েছেন : 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।' টিলায় আমার ঘর, প্রতিবেশী নেই।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'বিধি কৈল তোর মোর নেহে।' তোমার আমার প্রীতি সৃষ্টি করেছে বিধাতা।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ রেগে উঠেছে রাধা : 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা।' নান্দের ঘরের গরুর রাখালের সাথে আমার আবার প্রেম কী?

এভাবে বদলে গেছে ধ্বনি, বদলে গেছে শব্দের রূপ। বিচিত্র সে-সব পরিবর্তন। নানা নিয়ম আর রীতি সে-সব পরিবর্তনের। যদি কিছুই না বদলাতো, চিরকাল যদি মানুষ ধ্বনি উচ্চারণ করতো একইভাবে, তাহলে জন্ম নিতো না বাঙলা ভাষা। আমরা এখনো বলতাম প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ভাষা। তবে নদীতে জল যেমন স্থির নয় মানুষের মুখেও ধ্বনি স্থির নয়। চপল জিভের ছোঁয়ায় বদলে যায় চঞ্চল ধ্বনি। বদলেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার। বদলেছে প্রাকৃতের। শব্দ নতুন থেকে নতুন হয়ে উঠেছে। উদ্ভূত হয়েছে বাঙলা। বাঙলাও অবিচল স্থির নয়। বদলে যাচ্ছে তারও বহু কিছু। জটিল দুরূহ সূত্র সে-সব বদলের। সে-সবের মুখোমুখি এখন হচ্ছি না আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তুমি সে

আমি কথা বলি। তুমি শোনো। সে একটু বা অনেক দূরে আছে, তাই সে শোনে না। যে কথা বলে, সে বক্তা। যে শোনে, সে শ্রোতা। আরো আছে একজন, যে বক্তাও নয় শ্রোতাও নয়। কথা বলতে হ'লে বক্তা দরকার হয়, দরকার হয় শ্রোতা। কথা বলা হ'তে পারে আরেকজন সম্পর্কে। কথা বলার সময় বক্তা নিজেকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করে 'আমি'। শ্রোতাকে বোঝানোর জন্যে 'তুমি'। আর যে তৃতীয়জন, বক্তাও নয় শ্রোতাও নয়, তাকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করে 'সে'। এগুলোকে বলা হয় সর্বনাম। মনুষ্যসূচক সর্বনাম। মানুষের প্রতি নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার হয় এগুলো। বক্তা ও শ্রোতা ও তৃতীয় ব্যক্তি অনুসারে এগুলোকে ভাগ করা হয় তিনটি শ্রেণীতে। তখন আসে 'পুরুষ' ধারণাটি। বক্তা হচ্ছে উত্তম পুরুষ; এখন বলি, ইংরেজি পদ্ধতিতে, প্রথম পুরুষ। শ্রোতা হচ্ছে মধ্যম পুরুষ; এখন বলি দ্বিতীয় পুরুষ। আর অন্যজন হচ্ছে প্রথম পুরুষ; এখন বলি তৃতীয় পুরুষ। পৃথিবীর সব ভাষায়ই এ-তিন পুরুষের সর্বনাম আছে। আছে বাঙলায়ও।

মানসম্মান অনুসারেও আবার ভিন্ন হয় বাঙলা সর্বনাম। তবে যখন বলি 'আমি', তখন আমি নিজেকে সম্মানিত বা অসম্মানিত ব্যক্তি হিশেবে নির্দেশ করি না। বাঙলায় উত্তম বা প্রথম পুরুষের সর্বনাম একটিই : 'আমি'। এটি সমান-অসম্মান নিরপেক্ষ। বক্তার গৌরব করার কোনো সুযোগ নেই বাঙলায়। তবে কোনো কোনো ভাষায় সে-সুযোগ আছে। রাজারা ব্যবহার করে একরকম সম্মানসূচক 'আমি'। অন্যরা ব্যবহার করে সাধারণ 'আমি'। কিন্তু বাঙলায় তার উপায় নেই। আমাদের সকলের জন্যে একটিই 'আমি'। বক্তা শুধু নিজেকে নির্দেশ করতে পারে 'আমি' ব'লে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু শ্রোতার প্রবেশের সাথে সাথে ওঠে সম্মান-অস্মান, বা সম্ভ্রম-অসম্ভ্রমের ব্যাপারটি। আমি তিন ধরনের মানুষের মুখোমুখি হ'তে পারি। তিন ধরনের মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। যাঁর সাথে কথা বলছি আমি, তিনি যদি বয়সে আমার বড়ো হন বা হন শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত, তাহলে তাঁকে সম্বোধন করি 'আপনি' ব'লে। এ 'আপনি' বাঙলা ভাষায় আগে ছিলো না। সম্ভবত উনিশ শতকে এটি জন্ম নেয় বাঙলায়। সম্মানিত মানুষের সাথে কথা বলার সাথে সাথে অনেকগুলো ব্যাপার ঘ'টে যায়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাক্যের ক্রিয়ারূপের রূপবদল। আমার শ্রোতা যদি আমার কাছে শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত না হয়, যদি হয় আমার বন্ধু বা সমবয়স্ক বা ছোটো, আমি তাকে নির্দেশ করি 'তুমি' ব'লে। আর যদি সে একেবারে ছোটো হয়, আদরের হয়, তুচ্ছ হয়; তখন তাকে সম্বোধন করি 'তুই' ব'লে। মধ্যমপুরুষে বাঙলায় আছে তিনটি সর্বনাম। সম্মানসূচক : 'আপনি'। সাধারণ : 'তুমি'। আদরের বা অবজ্ঞার : 'তুই'।

তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তিরাও হ'তে পারেন সম্মানিত, হ'তে পারে অসম্মানিত বা সাধারণ। যদি তাঁর প্রতি সম্মান দেখাই, তাহলে তাঁকে বোঝানোর জন্যে বলি 'তিনি'। আর যদি অমন সম্মান দেখানোর দরকার না হয়, তাহলে 'সে'। তৃতীয় ব্যক্তিরা অনুপস্থিত থাকতে পারেন আলাপের সময়। কিন্তু তাঁদের মান-সম্মান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় আমাদের।

AMARBOI.COM

বাঙলা ভাষায় তিন পুরুষের আছে ছটি সর্বনাম। আমি। আপনি তুমি তুই। তিনি সে। এগুলোর আছে বিভিন্ন রকম রূপ। বহুবচন হ'লে এদের রূপ বদলে যায়। হয়ে ওঠে : আমরা। আপনারা তোমরা তোরা। তাঁরা তারা । বিভক্তি যোগ করলেও বিভিন্ন রূপ ধরে এগুলো। হয় : আমাকে, আমাদের, আমার। আপনাকে, আপনাদের, আপনার। তোমাকে, তোমাদের, তোমার। তোকে, তোদের, তোর। তাঁকে, তাঁদের, তাঁর। তাকে, তাদের, তার। এমন সব রূপ ধরে আমাদের সর্বনামগুলো।

এগুলো চিরকাল এমন ছিলো না। শুধু 'আপনি' ছাড়া আর সবকটি সর্বনাম প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সর্বনামের বিবর্তনের ফলে জন্ম নিয়েছে বাঙলায়। প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় এ-সর্বনামগুলোর ছিল নানা রূপ। আধুনিক কালে এগুলোর রূপ সুস্থিত হয়ে গেছে, যদিও অঞ্চলে অঞ্চলে টিকে আছে বিভিন্ন রূপে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তম বা প্রথম পুরুষের 'আমি'। প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় 'আমি'র পাওয়া যায় অনেকগুলো রূপ। প্রাচীন বাঙলায় 'আমি' ছিলো 'হাঁউ', 'আহ্মে', 'অহ্মে'। আদিমধ্য বাঙলায় 'আমি' ছিলো 'আহ্মে', 'আহ্মি', 'আহ্মী', 'আহ্মা', 'মোঞঁ', 'মোঞিঁ' প্রভৃতি। মধ্যযুগের শেষ দিকে 'আমি' ছিলো 'মো', 'মু', 'মুহি', 'আহ্মি', 'আমি' প্রভৃতি। আধুনিক কালে চলতি বাঙলায় 'আমি'। কিন্তু বিভিন্ন উপভাষায় আছে 'আমি'র অনেক রূপ। যেমন : 'মুই', 'হামি', 'হামা' ইত্যাদি। এই 'আমি'র রূপ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় ছিলো কেমন? সম্ভবত এটি বৈদিক ভাষায় ছিলো 'অস্মে'। তারপর সংস্কৃতে হয়ে যায় 'অস্মাভিঃ'। তার থেকে প্রাকৃতে হয়ে যায় 'অম্‌হে' ও 'অম্‌হাহি'। তার থেকে পুরোনো বাঙলায় হয় 'অহ্মে', 'আহ্মে', 'হাঁউ' ইত্যাদি। কয়েকটি উদাহরণ :

> "চর্যাপদ"-এ কবি ভাদেপাদ বলেছেন : 'এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁসু মোহে।' এতোকাল আমি ছিলাম মোহে।
>
> কবি সরহপাদ বলেছেন : 'আম্‌হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই।' অচিন্ত্যযোগী আমরা জানি না।
>
> "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় : 'শুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার'। রূপসী রাধা আমার কথা শোনো।
>
> কৃষ্ণ বলছে : 'এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি।' শিয়রে বাঁশি রেখে আমি শুয়ে ছিলাম।

'আমি' বললে এখন শুধু 'আমাকে'ই বোঝায়, শুধু বক্তাকে বোঝায়। কিন্তু পুরোনো বাঙলায় 'আহ্ম' বোঝাতো বহুবচন। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ 'আহ্মি' একবচন বোঝাতে শুরু করে। তখন তৈরি করা হয় বহুবচন রূপ 'আহ্মারা'।

মধ্যম বা দ্বিতীয় পুরুষের 'তুমি'। প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় 'তুমি'র পাওয়া যায় বহু রূপ। প্রাচীন বাঙলায় 'তুমি' ছিলো 'তু', 'তো', 'তুহ্মে', 'তুম্ভে'। আদিমধ্য বাঙলায় 'তুমি' ছিলো 'তোঞেঁ, 'তুঞিঁ', 'তুহ্মি', 'তোহ্মা'। মধ্যযুগের শেষ দিকে 'তুমি' ছিলো 'তুঞিঁ', 'তোহি', 'তোহ্মে', 'তোহ্মি', 'তুমি' প্রভৃতি। আধুনিক কালে এসব থেকে জন্ম নিয়েছে দুটি সর্বনাম। একটি হচ্ছে দ্বিতীয় পুরুষের সাধারণ সর্বনাম 'তুমি'। অন্যটি তুচ্ছার্থক 'তুই'। কী রূপ ছিলো 'তুমি'র অনেক আগে, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়? কেউ কেউ বলেন বৈদিক ভাষায় 'তুমি' ছিলো 'যুস্মে'। এর বিবর্তনেই জন্মেছে 'তুমি'। 'যুস্মে' হয়তো বৈদিকেই রূপ নিয়েছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুম্মে'। তা প্রাকৃতে হয়ে যায় 'তুম্‌হে' ও 'তুম্‌হাহি'। অপভ্রংশে 'তুম্‌হহি'। তা থেকে হয় পুরোনো বাঙলার 'তুহ্‌মে' 'তোহ্মি', 'তোহ্মে'। পরে হয় 'তুমি'। এখন যে তুচ্ছার্থে আমরা 'তুই' বলি, এটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় 'ত্বয়া' থেকে।

"চর্যাপদ"-এ চাটিল্লপাদ বলেছেন :'জই তুম্‌হে-লোঅ হে হোইব পারগামী।' যদি তোমরা সবাই পারগামী হ'তে চাও।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।' তোমার কথায় আমি যমুনায় যাবো।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'তঁবে তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি।' তখন তার বাঁশি নিয়ে তুমি ঘরে যেয়ো।

এখন আমরা সম্মানিতদের সম্বোধন করি 'আপনি' ব'লে। এটি দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানাত্মক সর্বনাম। এটি পুরোনো বাঙলায় ছিলো না। মধ্যবাঙলায় ছিলো না। আগে রাজাবাদশাকেও 'তুমি' ব'লেই সম্বোধন করা হতো। কিন্তু ক্রমে সম্বোধনে সম্মান প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে। তখন ধীরেধীরে 'নিজ'-আর্থক 'আপন' থেকে বানানো হয় সম্মানসূচক দ্বিতীয় পুরুষের 'আপনি'। 'আপনার চেয়ে আপন যে জন তারে খুঁজি আপনায়', 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে' বাক্যে 'আপন' বোঝায় 'নিজ'। এটি থেকেই সম্ভবত উনিশ শতকে বিকশিত হয় 'আপনি'।

তৃতীয় পুরুষের 'সে'। যারা সম্মানিত নয়, তাদের নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করি এটি। এটিরও ছিলো অনেক রূপ আদি ও মধ্য বাঙলায়। প্রাচীন বাঙলায় পাওয়া যায় 'সে', 'সো', 'স', 'সোই' প্রভৃতি রূপ। আদিমধ্য বাঙলায় পাওয়া যায় এর 'সো', 'সেহো', 'সেহি' 'সেনা' প্রভৃতি রূপ। মধ্যযুগের শেষ দিকে পাওয়া যায় 'সে','সেহ','সেহি', রূপ। এখন এর রূপ 'সে'। এটি এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার 'সকঃ' শব্দ থেকে। প্রাকৃতে এটি হয়ে যায় 'সো', 'শে'। প্রাচীন বাঙলায় হয় 'সো', 'সে', 'স'। তারপর এর একটিই রূপ 'সে'।

"চর্যাপদ"-এ পাই : 'হেরি সো মোরি তইল বাড়ী খসমে সমতুলা।' আমার খসম-সমান সে তৃতীয় বাড়ি দেখে।
"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।' কে বাঁশি বাজায় বড়ায়ি, সে কোনজন?
মালাধর বসু লিখেছেন : 'সেহ যদি অল্পজ্ঞান করিল আমারে।' সে যদি আমাকে অল্পজ্ঞান করলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পুরুষের সম্মানসূচক 'তিনি'। সম্মানিত কাউকে নির্দেশ করার জন্যে ব্যবহার করি এটি। প্রাচীন বাঙলায় এটির ব্যবহার খুব কম। প্রাচীন বাঙলায় পাওয়া যায় 'তো'। আদিমধ্য বাঙলায় পাওয়া যায় 'তেঁ', 'তেহেঁ', 'তেহোঁ'। মধ্যযুগের দ্বিতীয় ভাগে পাওয়া যায় 'তেঁহ', 'তিঁহো', 'তেঁহো', 'তিনি', 'তেনি' প্রভৃতি রূপ। আধুনিক বাঙলায় 'তিনি'। 'তিনি'র উৎপত্তি সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ মনে করেন অপভ্রংশের 'তিণি' থেকে এসেছে বাঙলা 'তিনি'।

> "চর্যাপদ"-এ পাই : 'তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না।' সে তিন সে তিন—তিন অভিন্ন।
>
> "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'বিরহ জ্বরেঁ তেহেঁ জরিলা।' বিরহ-জ্বরে তিনি আক্রান্ত।

এভাবেই পেয়েছি আমরা আধুনিক সর্বনামগুলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলেতে উঠিলী রাহী

জলেতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে। লিখেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। 'জলেতে উঠিলী রাহী?' জলে উঠলো রাধা? কেমন লাগে? জলে কী ক'রে ওঠে? কিন্তু কবি জলে ওঠার কথা বলছেন না। তিনি বলছেন যে রাধা জল থেকে উঠলো, অর্ধেক তার জলের ভেতরে। আমরা এখন বলি 'জল থেকে','বাড়ি থেকে'। 'থেকে' অর্থে ছশো বছর আগে বড়ু চণ্ডীদাস ব্যবহার করেছিলেন 'তে'। 'তে' একটি বিভক্তি। বাঙলায় বিশেষ্য ও সর্বনামের সাথে পদে পদে বিভক্তি বসে। 'আমি' আর 'তুমি' সর্বনাম, 'চিন' একটি ক্রিয়ামূল। এদের দিয়ে বাক্য বানালেই 'আমি' আর 'তুমি'র সাথে গেঁথে দিতে হবে বিভক্তি। তখন রূপ বদলে যাবে সর্বনামের। 'আমি তোমাকে চিনি', 'তুমি আমাকে চেনো'। 'কে' লাগানো হলো, আর রূপ বদলে গেল 'আমি' ও 'তুমি'র। বিভক্তি গেঁথে দিতে হয় বাঙলা বাক্যের বিভিন্ন পদে। বিভক্তির জন্যেই বাঙলা বাক্য বেশ নমনীয়; শব্দগুলোকে বাক্যের এদিকেসেদিকে সরানো যায়। বলতে পারি, 'তোমাকে চিনি আমি', 'চিনি তোমাকে আমি'। অর্থ ঠিক থাকে, শুধু শব্দের স্থান বদলে যায়।

নানা বিভক্তি আছে বাঙলায়। বাক্যের একটি পদকে বলা হয় 'কর্তা'। কর্তাপদে সাধারণত আধুনিক বাঙলায় বিভক্তি লাগে না। তবে লাগে বা লাগাই মাঝে মাঝে। বলি, 'মায়ে ডেকেছে','পাগলে ছাগলে কতো কী বলে আর খায়।' এখানে বিভক্তি লেগেছে 'এ' বা 'য়ে'। বাক্যে একটি পদকে বলে 'কর্ম'। কর্মে বিভক্তি লাগে। বলি : 'তোমাকে কী যে ভালো লাগে।' একটু গীতিময় হ'লে কেউ বলে : 'চিনিলে না আমারে কি, চিনিলে না।' একটু কোমল হয়ে বলি : 'তোমায় তো চিনেছি কালেকালে।' এখানে বিভক্তি পাচ্ছি 'কে', আর 'রে' আর 'য়'। এক ধরনের পদকে বলি 'করণ'। করণে বিভক্তি লাগে 'এ', 'তে'। কখনো লাগেও না। কখনো 'দ্বারা', 'দিয়ে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভক্তির কাজ করে। বলি : 'ছুরিতে কেটেছে', 'ছুরি দিয়ে কেটেছি'। অপাদানে এখন বিভক্তির বদলে 'থেকে' শব্দটি কাজ করে। বড়ু চণ্ডীদাস এখন লিখতেন : 'জল থেকে উঠলো রাধা'। অধিকরণে অর্থাৎ স্থান বোঝাতে বিভক্তি লাগে 'এ', 'তে' ইত্যাদি। অনেক সময় লাগেও না।

বাঙলা ভাষার শুরু থেকেই বাক্যের বিভিন্ন পদে বিভক্তি বসছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায়ও বিভক্তি বসতো। বসতো প্রাকৃতেও। কিন্তু শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাঙলায় বিভক্তিগুলো এক নয়। নানা রকম বদল ঘটেছে তাদের। অনেক বিভক্তি হারিয়ে গেছে। জন্ম নিয়েছে অনেকগুলো। অনেক পদ আবার এমন হয়ে উঠেছে যে বিভক্তি নিতে চায় না। বিভক্তি ছাড়াই কাজ চালায়। কিন্তু বিভক্তি আছে বাঙলায়। এগুলো আবার সুনির্দিষ্ট নয়। এমন নয় যে বিশেষ পদের জন্যে বিশেষ বিভক্তি নির্দিষ্ট। বাঙলায় একই রূপের বিভক্তি বসে বিভিন্ন পদে। আবার একই পদে বসে বিভিন্ন বিভক্তি। আমাদের বিভক্তিগুলোর ইতিহাস আছে।

আজকাল বাঙলায় কর্তাপদে সাধারণত কোনো বিভক্তি বসে না। হাজার বছর ধ'রেই এ-রকম হচ্ছে। পুরোনো বাঙলা, মধ্য বাঙলায় সাধারণত কর্তাপদ বিভক্তিশূন্যই থাকতো। ব্যাকরণরচয়িতারা এ-শূন্যতার নাম দিয়েছেন 'শূন্যবিভক্তি'। যেমন, "চর্যাপদ"-এ :

'ভণই কাহ্ন আহ্মে ভলি দাহ দেহুঁ।' কাহ্নপাদ বলে আমি ভালো দান দিই।

'ভণই কাহ্ন মো-হিঅহি ণ পইসই।' কাহ্নপাদ বলে আমার হৃদয়ে পশে না।

'ভুসুকু ভণই মূঢ়হিঅহি ণ পইসই।' ভুসুক বলে মূঢ়ের হৃদয়ে পশে না।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় :

'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।' বাসলীভক্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল।

'কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।' বড়ায়ি কৃষ্ণকে মধুর বচন বললো।

'সপনে দেখিলো মো কাহ্ন।' স্বপ্নে আমি কৃষ্ণকে দেখলাম।

কর্তায় 'এ' আর 'এঁ' পাওয়া যায় আদিযুগে ও মধ্যযুগে। "চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় :

'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।' গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়।

'কানেট চোরে নিল অধরাতী।' আধরাতে চোরে নিলো কানেট।

'ভণথি কুক্কুরীপাএ ভব থিরা।' কুক্কুরীপাদ বলে জগৎ স্থির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় :

'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।' বড়ু চণ্ডীদাস গাইলো।

'প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল।' কংশ প্রথম পুতনাকে নিয়োগ করলো।

'তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে।' তুমি কেনো আমাকে সে-কথা বলো।

কিন্তু এই 'এ' খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। আধুনিক বাঙলায় এটি তো দুষ্প্রাপ্যই, এমনকি আদি ও মধ্যযুগেও এটি বিরল।

কর্মে এখন সবচেয়ে প্রতাপশালী হচ্ছে 'কে'। কবিতায় কিছুকাল আগেও 'রে' বসতো ফিরেফিরে। অনেক কর্মে কোনো বিভক্তিই বসে না। 'আমি তোমাকে পছন্দ করি' বলার সময় 'তুমি'র সাথে একটি 'কে' গেঁথে দিতে বাধ্য হয়েছি। না দিলে বাঙলাই হতো না। বলতে তো পারি না 'আমি তুমি পছন্দ করি'। কিন্তু বলতে পারি 'আমি ফুল পছন্দ করি', 'তুমি মেঘ ভালোবাস', আর 'সে বাঘ মারে'। চিরকালই বাঙলায় অনেক কর্মে কোনো বিভক্তি বসে না। পুরোনো বাঙলায় কর্মে 'এ' আর 'এঁ' বসতো। আদিমধ্যযুগে এদের সাথে যোগ দেয় আরো কয়েকটি কর্মবিভক্তি। বসতে শুরু করে 'ক' আর 'কে' আর 'রে' বিভক্তি, আর মধ্যযুগের শেষভাগে দেখা দেয় 'ত', 'তে' ও 'কারে' বিভক্তি। কর্মে কোনো বিভক্তি না থাকার উদাহরণ পাই "চর্যাপদ"-এ :

'পুণ সইআঁ আপণা চটারিউ।' পুনরায় নিজেকে নিয়ে নিঃশেষ হলাম।

'রূপা থোই নাহিক ঠাবী।' রুপো রাখার ঠাঁই নেই।

'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ।' লুইপাদ বলে গুরুকে জিজ্ঞেস ক'রে জানো।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাওয়া যায় কর্মে 'এ' ও 'রে'র উদাহরণ :

'ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ।' তিনভুবনের লোকেরা তোমাকে চেনে।

'বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ।' জগন্নাথ তোমাকে বুঝতে পারলাম না।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পাওয়া যায় কর্মপদে 'ক', 'কে' ও 'তে' বিভক্তি। কয়েকটি উদাহরণ :

'লক্ষ্মীক বলিল দেবগণ'। দেবতারা লক্ষ্মীকে বললো।

'দেহ রাধা কাহ্নাইক আশ।' রাধা কৃষ্ণকে আশা দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থাকিব যোগিণী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ'। তোমাকে সেবা ক'রে যোগিণী হয়ে থাকবো।

'তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে।' তোমাকে আমি বাণ মারলাম।

'কহিলোঁ মো তোহ্মাতে স্বরূপ।' তোমাকে ঠিক কথা বললাম।

করণপদে এখন বিভক্তি বসে 'এ' আর 'তে'। অনেক সময় কোনো বিভক্তি লাগেও না করণে। মধ্যযুগের শেষভাগে ছিলো 'এ', 'ত', আর 'তে'। প্রথম ভাগে ছিলো 'এঁ, 'এ' আর 'ত'। "চর্যাপদ"-এর বাঙলায় পাওয়া যায় করণের বিভক্তি 'এঁ', 'এ', 'এতেঁ'। এই 'এঁ' বিভক্তিটিই মজার।

"চর্যাপদ"-এ কাহ্নপাদ বলেন : 'দেহ-নঅরী বিহরএ একারেঁ।' এক নাগাড়ে দেহ-নগরে বিহার করে।

"চর্যাপদ"-এর কবি বলেন : 'ভণই কঙ্কন কলএল সাদেঁ।' কঙ্কনপাদ কলকল শব্দে বলে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ বড়ায়ি বলে : 'তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে।' তোমার ইঙ্গিতে মাণিকে বিঁধে হীরে।

অধিকরণে, স্থান বোঝাতে, এখন 'এ' আর 'তে' বিভক্তি বসে। কখনোকখনো বিভক্তি লাগেও না। আদি ও মধ্যযুগে অধিকরণের ছিলো একরাশ বিভক্তি। পুরোনো ও মধ্য বাঙলায় 'এঁ', 'এ' ছিলো। মজার হচ্ছে পুরোনো বাঙলায় 'হিঁ' বা 'হিঁ', আর পুরোনো ও মধ্য বাঙলার 'ত'। যেমন :

"চর্যাপদ"-এ ভুসুকু বলেন : 'মূঢ়া হিঅহি ণ পইসই।' মূঢ়ের হৃদয়ে পশে না।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'বাহুত বলয় শোভে পাএত নূপুর।' বাহুতে বলয় পায়ে নূপুর শোভে পায়।

রাধা বলে: 'নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।' নিকুঞ্জে আর যমুনার তীরে খোঁজো।

এভাবেই হাজার বছর ধ'রে বদলিয়েছে আর টিকে আছে বিভিন্ন পদের বিভক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহুবচন

একের পরে দুই। কিন্তু বচনে একের পরেই বহু। একলা থাকতে পারি আমি। তাহলে শুধু আমি; —একা, একলা, একজন। আমি একবচন। আমার সাথে থাকতে পারে অন্য কেউ; —সে অথবা তুমি। বা সে আর তুমি। তখন সে তুমি আর আমি মিলে হয়ে উঠি আমরা। তুমি আর আমি মিলেও আমরা। সে আর আমি মিলেও আমরা। বহুবচন। একটি পাখি আকাশে। পাখিটি একবচন। দুটি বা অনেক পাখি আকাশে। তখন বলি, 'পাখি দুটি', বা 'পাখিরা'। বহুবচন। একটি, একজন হ'লে একবচন। একের বেশি হ'লেই বহুবচন।

AMARBOI.COM

পৃথিবীর সব ভাষায়ই বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের একবচন ও বহুবচনের রূপে পার্থক্য আছে। একবচনে শব্দটি এক রকম; বহুবচনে অন্য রকম। সাধারণত একবচনের রূপের সাথে নানা কিছু যোগ ক'রে তৈরি করা হয় শব্দের বহুবচনের রূপ। বাঙলায় 'রা', 'এরা' যোগ করলে শব্দ বহুবচন হয়। 'ছেলে' একবচন। 'ছেলেরা' বহুবচন। 'লেখক' একবচন। 'লেখকেরা' বহুবচন। অনেক সময় যোগ করি 'গুলো'। 'পাখি' একবচন। 'পাখিগুলো' বহুবচন। আছে আরো কয়েকটি বহুবচনের চিহ্ন : 'দল', 'গণ', 'বৃন্দ', 'সমূহ' প্রভৃতি। বলতে পারি 'ছাত্রদল', 'শিক্ষকগণ', 'অতিথিবৃন্দ', 'পুস্তকসমূহ'। এগুলো বহুবচন। আরো আছে সংখ্যা আর সমষ্টিবাচক শব্দ : 'দুই', 'তিন'; এবং 'অনেক','বহু', 'সব' প্রভৃতি শব্দ। 'দুটি ছেলে', 'অনেক মেয়ে', 'বহু মানুষ', 'সব পাখি' বহুবচন।

এগারো শো বছর ধ'রে তো একই রকমে বহুবচন প্রকাশ করতে পারে না একটি ভাষা। বাঙলা ভাষার যখন জন্ম হয়েছিলো তখনি এর সব রকম বিকাশ ঘটে যায় নি। যেমন ঘটে নি বহুবচনের রূপে। এখন এক রকম বহুবচন শব্দ গঠিত হয় শব্দের রূপ বদল ক'রে। "চর্যাপদ"-এর কালে রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলের ব্যাপারটি শুরু হয় নি। তখন শব্দটি ঠিকই থাকতো, আর তার আগে বা পরে অন্য শব্দ বসিয়ে বহুত্ব বোঝানো হতো। 'লোঅ' (লোক) শব্দটি শব্দের পরে বসিয়ে বহুবচন বানানো হতো কখনো। যেমন : 'পারগামিলোঅ' (পারগামীরা), 'বিদুজণলোঅ'(বিদ্বজ্জনেরা), 'তুমহে লোঅ' (তোমরা)। কখনো সমষ্টিবাচক শব্দ দিয়ে বোঝানো হতো বহুত্ব। "চর্যাপদ"-এ পাই 'সকল সমাহিঅ' (সকল সমাধা করা হলো),'সঅল সহাবে' (সকল স্বভাবে), 'ণাণা তরুবর' (নানা গাছ)। সংখ্যা শব্দ দিয়েও বোঝানো হতো বহুত্ব। যেমন : 'বতিস জোইণী' (বত্রিশ যোগিনী), 'চউষঠ্‌ঠী পাখুড়ী' (চৌষট্টি পাপড়ি)। শব্দ দুবার ব্যবহার ক'রেও বহুত্ব বোঝানো হতো। যেমন : 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত' (উঁচু উঁচু পর্বত), 'জে জে আইলা' (যে যে এলো)। এ-নিয়মগুলো বাঙলায় এখনো আছে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এও এভাবেই প্রকাশ করা হয় বহুবচন। আর এ-কাব্যেই জন্ম নেয় বাঙলা ভাষার বিখ্যাত বহুবচন চিহ্ন 'রা'। সমষ্টিবাচক 'সব' দিয়ে বারবার বহুবচন প্রকাশ করা হয়েছে এ-কাব্যে। পাওয়া যায় 'তোহ্মে সব' (তোমরা), 'সব দেব', 'সব পসারু', 'সব গুআ পানে'। 'যত', 'নানা' প্রভৃতি দিয়েও প্রকাশ করা হয়েছে বহুত্ব। এ-কাব্যে পাই 'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ', 'নানা ফুল খাএ নারায়ণে', 'বুইলোঁ সব সখিজনে'।

'গণ' চিহ্নটি এখন শুধু সম্ভ্রমাত্মক শব্দের সাথেই বহুবচন বোঝানোর জন্যে বসে। আমরা বলি 'পণ্ডিতগণ', 'ছাত্রগণ', 'শিক্ষকগণ'। বলি না 'বইগণ', 'পুতুলগণ'। কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ বস্তুবাচক শব্দের সাথে নির্বিচারে বসেছে 'গণ'। পাওয়া যায় 'বাদ্যগণ', 'তরুগণ', 'দুখগণ', 'প্রণামগণ'। মধ্যযুগের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন কাব্যে পাওয়া যায় 'হারগণ', 'হাণডীগণ', 'মেঘ তারাগণ', 'গিরিগণ', 'মঙ্গলগণ' প্রভৃতি প্রয়োগ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে বহুবচন বোঝানোর জন্য 'রা'-র ব্যবহার। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরুষের সর্বনামের বহুবচন বোঝাতে মাত্র তিনবার বড়ু চণ্ডীদাস 'রা' প্রয়োগ করেছেন এ-কাব্যে। তাঁর সে-অবিস্মরণীয় প্রয়োগ তিনটি হচ্ছে : 'আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী', 'আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে', ও 'পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে'। এখানেই পাই 'আমরা', 'তোমরা'র পূর্বপুরুষ 'আহ্মারা', 'তোহ্মারা'।

'রা' জন্ম নেয়। কিন্তু সহজে জয় করতে পারে নি বাঙলা বিশেষ্যকে। পনেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত 'রা' কাজ ক'রে চলে সর্বনামের বহুবচন চিহ্নরূপেই। তারপর শুরু হয় এর জয়ের যুগ। বসতে শুরু করে বিশেষ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে। কবি মুকুন্দরাম লিখেছেন, 'বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল।' কবি দ্বিজ বংশীদাস লিখেছেন, 'কুমারেরা রড়ারড়ি যাএ'; কবি রূপরাম লিখেছেন, 'যুবতীরা কয়'। এভাবে বেড়ে চলে 'রা'র রাজ্য।

বহু বোঝাতে 'গুলো' এখন আমরা ব্যবহার করি খুব। এটা কয়েক বছর আগেও ছিলো, এমনকি এখনো কারো কারো মুখে, 'গুলি'। এটি মধ্যযুগ থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে বাঙলায়। তখন এর রূপ ছিলো 'গুলা'। ষোলো শতকে এর জন্ম। কবি মুকুন্দরাম লিখেছেন, 'ঘরগুলা করে দলমল।' কবি রূপরাম লিখেছেন,'সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধিগুলি কে দিবেক বেটে।' 'গুলা', 'গুলি' এখন চলতি বাঙলায় 'গুলো'।

চলতি বাঙলায় একটি জটিল বহুবচন চিহ্ন হচ্ছে 'দের'। কর্তা নয় এমন বিশেষ্যপদে এটি বসে। আমরা বলতে পারি 'মেয়েরা এলো'। বলতে পারি না 'মেয়েদের এলো'—এটা ভুল। কিন্তু বলতে পারি 'আমি মেয়েদের দেখেছি'। বলতে পারি না 'আমি মেয়েরাকে দেখেছি'; এটা ভুল। 'রা' (আর 'এরা') বসে কর্তাপদে। 'দের' বসে কর্তা নয় এমন পদে। তবে আরো একটি 'দের' আছে বাঙলায়। এবং জটিলতা সেখানেই। 'আমাদের বাগান', আর 'তোমাদের ফুল'-এ 'দের' সম্বন্ধ বোঝাচ্ছে। বহুবচনের 'দের', আর সম্বন্ধের 'দের' কি একই 'দের'?

বহুবচনের 'দের'-এর কথায় আসি। সাধুভাষায় এটি ছিলো কখনো 'দিগ' কখনো 'দিগের'। সাধুভাষায় পাওয়া যায় 'তোমাদিগকে', 'তোমাদিগের'। এই 'দিগ' নাকি এসেছে সংস্কৃত 'আদি' থেকে। দ্বিজ মাধব লিখেছেন, 'বরুণ পবন শক্র দুর্বাসাদি।' কৃত্তিবাস লিখেছেন, 'তাহাদিগে ধরিআঁ আনহ মোর ঠাঁই।' মাণিকরাম লিখেছেন, 'আমাদিকে সঙ্গে কর্‍্যা।' ফারসিতে একটি শব্দ আছে 'দিগর', যার অর্থ 'অন্য, আরো'। কেউকেউ মনে করেন 'দিগ'-এর জন্মে ফারসি 'দিগর'-এর ভূমিকা আছে। কবি কেতকাদাস, সতেরো শতকে, তাঁর "মনসামঙ্গল"-এ লিখেছেন, 'ব্রাহ্মণের গরু রাখে বসুয়া দিগর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইসসি যাসি করসি

আইসসি যাসি করছি। এমন বলতাম আমরা হাজার বছর আগে, আটশো বছর আগে। এখন বলি—আসো যাও করো। ক্রিয়া খুব মজার জটিল জিনিশ। অনেক কিছু প্রকাশ করতে হয় ক্রিয়াকে। আরো একটু যথাযথ হওয়ার জন্যে বলতে হয় : অনেক কিছু প্রকাশ করতে হয় ক্রিয়ারূপকে। ক্রিয়ারূপ। যেমন : আইসসি যাসি করসি। আসো যাও করো। পোহাইলি ভইলী লেলি। পোহালে হ'লে নিলে। নানা রকম ক্রিয়ারূপ আছে বাঙলায় : করি, করছি, করেছি। করলাম, করছিলাম, করেছিলাম। করবো। এ-রূপাগুলোর দুটি বড়ো অংশ। একটি অংশ হচ্ছে ক্রিয়ামূল, যা ক্রিয়া বোঝায়; আরেকটি অংশ বোঝায় অনেক কিছু। 'করি'কে দু-ভাগ করলে পাই 'কর্' ও 'ই'। 'করছি' কে দু-ভাগে ভাগ করলে পাই 'কর্' ও 'ছি'। 'করেছি'কে দু-ভাগে ভাগ করলে পাই 'কর্' ও 'এছি'। এভাবেই দু-ভাগে ভাগ করা যায় 'করলাম', 'করছিলাম', 'করেছিলাম', 'করবো' ও অন্য ক্রিয়ারূপগুলোকে। প্রথম ভাগটি বোঝায় ক্রিয়া। 'কর্', 'ধর্', 'বল্', 'খা' নানা রকমের ক্রিয়া। আর দ্বিতীয় ভাগটি?

ক্রিয়ারূপের দ্বিতীয় ভাগকে ব্যাকরণে বলা হয় 'ক্রিয়াবিভক্তি'। নামটি ঠিক হয় নি। এটির নাম দেওয়া যাক 'ক্রিয়াসহায়ক', যা সহায়তা করে ক্রিয়াকে। অনেক ক্রিয়াসহায়ক আছে বাঙলায় : 'ই', 'ছি', 'এছি', 'লাম', 'ছিলাম', 'এছিলাম', 'বো', 'ও', 'ছো', 'এছো'র মতো অনেক ক্রিয়াসহায়ক আছে আমাদের। এগুলোকে পৃথক করলে মাথার ভেতর জট পাকিয়ে যায়। কিন্তু কথা বলার সময় ঠিকই ব্যবহার করি এগুলো।

কী প্রকাশ করে এ-ক্রিয়াসহায়কগুলো? উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। আমি বললাম, 'পড়ছি'। এর প্রথম অংশ পড়্', দ্বিতীয় অংশটি 'ছি'। 'পড়্' বোঝায় লিখিত কিছু বিশেষ এক রকমে আয়ত্ত করা। 'ছি' কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝায়? 'পড়ছি' বলার সাথে সাথে বোঝায় যে পাঠক হচ্ছি 'আমি'। 'আমি' উত্তম বা প্রথম পুরুষের সর্বনাম। তাই 'ছি' বোঝায় বাক্যের কর্তা কোন পুরুষের। আবার পড়ছি বলার সাথে সাথে বুঝি পড়ার কাজটি ঘটছে বর্তমান কালে। তাই 'ছি' কাল বোঝায়। আরো বোঝায় যে পড়ার কাজটি এখনি ঘটছে। অর্থাৎ ক্রিয়ার রীতি বোঝাচ্ছে—ক্রিয়া কী রীতিতে সম্পন্ন হচ্ছে, তা বোঝাচ্ছে। তাই দেখতে পাচ্ছি বাঙলা ক্রিয়ারূপের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ক্রিয়াসহায়ক তিন রকম ব্যাপার বোঝায়। পুরুষ বোঝায়, কাল বোঝায়, ক্রিয়ার রীতি বোঝায়।

বাঙলা ক্রিয়াসহায়কগুলো পুরুষ, কাল ও ক্রিয়ার রীতি বুঝিয়ে আসছে বাঙলা ভাষার জন্মের কাল থেকেই। কিন্তু এগুলো চিরকাল রূপে একই রকম থাকে নি। রূপ বদলিয়েছে কালেকালে। তবে রক্ষা করেছে ধারাবাহিকতা। কাল হ'তে পারে বর্তমান; হ'তে পারে অতীত; পারে হ'তে ভবিষ্যৎ। পুরুষ হ'তে পারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। ক্রিয়া ঘটতে পারে নানা রীতিতে—এইমাত্র শেষ হ'তে পারে ক্রিয়াটি। ক্রিয়াটি এখনো চলতে পারে। চলতে পারে আরো অনেক কাল ধ'রে। এ-সবই ধরা পড়ে ক্রিয়ারূপের দ্বিতীয় অংশে, ক্রিয়াসহায়কে।

ক্রিয়াসহায়কের রূপ নানাভাবে বদলিয়েছে। ক্রিয়াসহায়ক সংখ্যায়ও প্রচুর। সবগুলোর পরিচয় এখানে দিচ্ছি না, দিলে মাথার ভেতর হৈচৈ শুরু হয়ে যাবে। কয়েকটির কথা শুধু বলি।

এখন বর্তমান কালের একটি ক্রিয়াসহায়ক হচ্ছে 'ই'। করি, বলি, চলি, দেখি-তে, কর্, বল্, চল্, দেখ্-এর সাথে যোগ করেছি 'ই'। পুরোনো বাঙলায়, "চর্যাপদ"-এ, ছিলো তিনটি ক্রিয়াসহায়ক। 'ম', 'মি' আর 'হুঁ' বা 'হু'। এখন বলি 'যা নিয়ে আছি', "চর্যাপদ"-এর কবি লুইপাদ বলেছেন, 'জা লই অচ্ছম'। 'অচ্ছম' এখন 'আছি'। এখন বলি 'জানি না'; কবি আর্যদেব বলেছেন, 'ণ জানমি'। 'জানমি' এখন 'জানি'। এখন বলি 'দাবা খেলি'। কবি কাহ্নপাদ হাজার বছর আগে বলেছিলেন, 'খেলহুঁ নঅবল'। 'খেলহুঁ' আজকের 'খেলি'।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'গেল', 'কৈলঁ'। 'ম','মি','হুঁ' আর নেই। তাদের জায়গা দখল করেছে অন্যরা। যেখানে "চর্যাপদ"-এর কবিরা ব্যবহার করতেন 'ম', 'মি', 'হুঁ', আর এখন আমরা যেখানে ব্যবহার করি 'ই', সেখানে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এর কালে বসতো 'অওঁ', 'ওঁ/ও','ই/ঈ', আর 'ইএ'। এখনকার 'ই' দেখা দেয় প্রথম "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এই। এখন বলি, 'বিশ্রাম করি', রাধা বলেছে : 'করো বিসরামে'। এখন বলি, 'প্রাণ দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি তোমার কথায়', বড়ায়ি বলেছে : 'পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে'। এখন বলি, 'আমি করতে পারি'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই 'কবিরাক পারি'। এখন বলি, 'আমি যাই'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ রাধা বলেছে, 'আহ্মে জাইএ'।

এখনকার 'ই'র নানা রূপ ছিলো মধ্যযুগের দ্বিতীয় ভাগে। কখনো তা 'ওঁ', কখনো তা 'ম'। কখনো 'ও', কখনো 'হোঁ', কখনো 'হুঁ', কখনো 'উঁ'। কখনো আবার তা 'ইএ', কখনো 'ই'। নানা রূপ। কবি দ্বিজ মাধব লিখেছেন, 'বন্দম দিনকরনাথ', 'কহম তোমারে'। মালাধর বসু লিখেছেন, 'কন্দর্প সমান দেখোঁ', 'বলহোঁ তোমারে'। চূড়ামণি দাস লিখেছেন, 'না জানিএ না মানিএ না ভজিয়ে আন'; অর্থাৎ অন্যকে জানি না মানি না ভজি না। কৃত্তিবাস লিখেছেন, 'বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিউ কথন।'

তিন পুরুষ, তিন কাল, আর ক্রিয়া ঘটার রীতি অনেক। তাই ক্রিয়াসহায়কও অনেক। সবগুলোর কথা এখানে বলার উপায় নেই। শুধু কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি, তাতেই বোঝা যাবে কালে কালে এগুলো কেমন হয়েছিলো।

"চর্যাপদ"-এ পাই : 'আইসসি, যাসি, পুছসি, বুঝসি'। আসো, যাও, জিজ্ঞেস করো, বোঝো।

"চর্যাপদ"-এ পাওয়া যায় : 'অচ্ছই, ভণই, জাগঅ, ভণন্তি, নাচন্তি'। আছে, বলে, জাগে, বলে, নাচে।

"চর্যাপাদ"-এ পাই : 'বাহিউ, পোহাই, বুঝিঅ, দেখিল, ফিটলেসু'। বাইলাম, পোহালাম, বুঝলাম, দেখলাম, মুক্ত হলাম।

"চর্যাপদ"-এ পাই : 'মারিহসি, করিহ, করিব, হোইব'। মারবে, করবে, করবো, হবে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'খাইলোঁ, হারায়িলোঁ, পড়িলাহোঁ, বধিল'। খেলাম, হারালাম, পড়লাম, বধলাম।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'গেলা, কৈলেঁ, এড়ালেহেঁ, নিলেহেঁ। গেলে, করলে, এড়ালে, নিলে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ পাই : 'করিবোঁ, জাণায়িবোঁ, কাটায়িব, দিবওঁ। করবো, জানাবো, কাটাবো, দেবো।

কতো রূপ এগুলোর। কালেকালে ধরেছে কতো না রূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালি রুপোলি শিকি

রাজকোষ ভ'রে জমেছে মোহর আর আশরফি। সোনার ঝকমকে মুদ্রা। রুপোর চকচকে শিকি। হাতে নিলে ঝকঝক চকচক ক'রে ওঠে, বেজে ওঠে জলতরঙ্গের মতো। এক মুঠো মুদ্রা হাতে নিলে মনে হয় মুঠোতে জমেছে আকাশের জ্যোতির্ময় তারাগণ। সোনালি মুদ্রায় রুপোলি মুদ্রায়, সোনালি শিকিতে রুপোলি শিকিতে ঐশ্বর্যশালী হয় রাজকোষ। যে-রাজকোষে যতো বেশি মুদ্রা, সে-রাজকোষ ততো বেশি ধনাঢ্য। ভাষার রাজকোষ ভ'রে থাকে শব্দে। সোনালি শিকির মতো শব্দ, রুপোলি আধুলির মতো শব্দ, ঝলমল করে চকচক করে। যে-ভাষার ভাণ্ডারে যতো বেশি শব্দ সে-ভাষা ততো বেশি ধনী। শব্দগুলো সোনালি রুপোলি শিকির মতো। ধাতুতে তৈরি নয়, ধ্বনিতে তৈরি। তবু ধাতুর মতোই টেকসই। এক সময় সোনা ক্ষ'য়ে যায়, মলিন হয়ে ওঠে রুপো। ঘষা পয়সায় পরিণত হয় রাজমুদ্রা। শব্দগুলোও তেমনি।

যেনো কোনো রাজা শব্দের শিকি আধুলি—মোহর আর আশরাফি—বানিয়ে ছেড়েছে জনগণের মধ্যে। টাকা দিয়ে মানুষ জিনিশ কেনে। শব্দ দিয়ে কেনে একে অন্যকে, একে অন্যের মনোভাবকে। আমরা মনের কথা প্রকাশ করি আমি শব্দে। তোমার মনের কথা তুমি জানিয়ে দাও শব্দে। যতো শব্দ থাকে ততোই সুবিধা হয় ভাষা ব্যবহারকারীদের। মুদ্রা যেমন এক সময় মলিন হয়ে যায়, পরিণত হয় ঘষা পয়সায়, শব্দও তেমন অনেকটা। এক সময় যে-শব্দ চলে কোনো ভাষায়, কয়েক বছরে সে-শব্দের কোনো কোনোটি মলিন হয়ে পড়ে। মানুষেরা তখন সেটি কম ব্যবহার করে। এক সময় সেটি চ'লে যায় ব্যবহারের বাইরে, পরিণত হয় ঘষা শব্দে। তখন তৈরি হয় নতুন শব্দ। চকচক করলেই কোনো কিছু সোনা হয় না, কিন্তু চকচকে জিনিশ পছন্দ করে মানুষেরা। পছন্দ করে চকচকে শব্দও। যুগে যুগে ভাষার শব্দও বদলাতে থাকে। অনেক শব্দ হারিয়ে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মে নতুন শব্দ, নতুনতর শব্দ। ধনশালী হয়ে ওঠে ভাষা। ভাষা শব্দের সোনালি রুপোলি শিকির রাজকোষ।

একএকটি শব্দ প্রকাশ করে একটি বা একাধিক অর্থ বা ভাব বা ধারণা। কেউ কেউ পেয়ালার সাথেও তুলনা করে শব্দের। পেয়ালায় আছে এক পেয়ালা দুধ। দুধটুকু শুষে নিলে বা ফেলে দিলে পেয়ালাটি শূন্য। শব্দ-পেয়ালায় তেমনি ভরা থাকে ভাব বা অর্থ। 'চাঁদ' শব্দের পেয়ালাটিকে ঢেলে দিলে গড়িয়ে পড়ে আকাশের উজ্জ্বল উপগ্রহের ভাব। 'ভালোবাসি' শব্দের পেয়ালাটিতে টলমল করে আমাদের হৃদয়মনের আবেগের দুগ্ধ। ভাবে ভ'রে আছে শব্দের পেয়ালা।

বাঙলা ভাষায় আছে অজস্র শব্দ। কতো শব্দ আছে, তা কারো জানা নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে জমেছে শব্দের শিকি আধুলি বাঙলা ভাষার ভাণ্ডারে। তাতে ধনী হয়ে উঠেছে বাঙলা ভাষা। বহু শব্দের শিকি জমেছিলো বাঙলা ভাষার শুরুর কালে। যতোই দিন যেতে থাকে জমতে থাকে নতুননতুন শব্দ। হারিয়ে যেতে থাকে শব্দ। জমতে থাকে আরো নতুন শব্দ। আছে 'তুমি'র মতো ছোট্ট মিষ্টি শব্দ। ছিলো 'আলিএ'র মতো শব্দ; ছিলো 'ফাডডিঅ'র মতো শব্দ। আছে 'জমি', 'চাষ', 'আগুন', 'পাখি', 'নদী'র মতো চেনা শব্দ। ছিলো 'সন্ধ্যা', 'কোঁয়রী', 'শিশে', 'রেহা'র মতো কিছুটা চেনা কিছুটা অচেনা শব্দ। আছে 'চাঁদ', 'তারা', 'বই','স্বপ্ন', 'আকাশ', 'জ্যোৎস্না'র মতো শব্দ। ছিলো 'অপত্রপা', 'অক্রুবাণ', 'সৈংহিকেয়', 'প্রাডিবব্যক,' 'উৎকলিকাকুল', 'আস্যদেশ', 'কোকিলকলালাপবাচাল', 'সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লারাজীব'-এর মতো শব্দ। বহু আছে কিছু নেই। বহু থাকবে কিছু থাকবে না। বাঙলা ভাষার ভাণ্ডার ভরা থাকবে শব্দে।

বাঙলা ভাষার শব্দগুলো কি শুধুই বাঙলার? বাঙলা ভাষা কি ধনী শুধুই নিজের ধনে? পৃথিবীতে কখনো কি কেউ শুধু নিজের ধনে ধনী হয়েছে? না, হয় নি কখনোও, ধনীদের ধনভাণ্ডারের একটি অংশ নিজেদের, অন্য অংশটি পরের। তারা ব্যবসা ক'রে বাড়ায় নিজের ধন, আর সাথেসাথে হরণ করে অনেকটা পরের ধন। ভাষার বেলাও তাই। বাঙলা ভাষার শব্দের একটি বড়ো অংশ নিজের, বাঙলার। আরেকটি অপরের, অন্য ভাষার। বাঙলা ভাষার ভাণ্ডার ভ'রে আছে নিজের ধনে ও পরের ধনে। তাই বাঙলায় পাই দু-রকম শব্দ; বাঙলা শব্দ ও বিদেশি শব্দ বা ভিন্ন ভাষার শব্দ। বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দগুলো হরণ ক'রে আনে নি বাঙলা ভাষা। গ্রহণ করেছে। আর অনেক সময় তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা শব্দ

সুকুমার সেন এ-শ্রেণীর শব্দকে বলেছেন 'মৌলিক শব্দ'। অর্থাৎ এ-সব শব্দেই গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার মূল অবয়ব বা কাঠামো। পরিমাণেও এসব শব্দই বেশি। তিন রকম শব্দ পড়ে এ-শ্রেণীতে। বাঙলা ভাষার এক রকম শব্দকে বলা হয় 'তদ্ভব শব্দ'। আরেক রকম শব্দকে বলা হয় 'তৎসম শব্দ'। এবং আরেক রকম শব্দকে বলা হয় 'অর্ধতৎসম শব্দ'। এ-তিন রকম শব্দ মিলে গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষার শরীর। 'তৎসম', 'তদ্ভব' পারিভাষিক শব্দগুলো চালু করেছিলেন প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণরচয়িতারা। তাঁরা 'তৎ' অর্থাৎ 'তা' বলতে বোঝাতেন 'সংস্কৃত' (এখন বলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য) ভাষাকে। আর 'ভব' শব্দের অর্থ 'জাত, উৎপন্ন'। তাই 'তদ্ভব' শব্দের অর্থ হলো 'সংস্কৃত থেকে জন্ম নেয়া'; আর 'তৎসম' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সংস্কৃতের সমান' অর্থাৎ সংস্কৃত। বাঙলা ভাষার শব্দের শতকরা বায়ান্নটি শব্দ 'তৎভব' ও অর্ধতৎসম'। শতকরা চুয়াল্লিশটি 'তৎসম'। তাই বাঙলা ভাষার শতকরা ছিয়ানব্বইটিই মৌলিক বা বাঙলা শব্দ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ বেশ নিয়মকানুন মেনে রূপ বদলায় মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় অর্থাৎ প্রাকৃতে। পরিণত হয় প্রাকৃত শব্দে। শব্দগুলো গা ভাসিয়ে দিয়েছিলো পরিবর্তনের স্রোতে। প্রাকৃতে আসার পর আবার বেশ নিয়মকানুন মেনে তারা বদলে যায়। পরিণত হয় বাঙলা শব্দে। এগুলোই তদ্ভব শব্দ। এ-পরিবর্তনের স্রোতে ভাসা শব্দেই উজ্জ্বল বাঙলা ভাষা। তবে তদ্ভব শব্দগুলো সংস্কৃত বা প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই শুধু আসে নি। এসেছে আরো কিছু ভাষা থেকে। তবে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকেই এসেছে বেশি সংখ্যক শব্দ।

'চাঁদ', 'মাছ', 'এয়ো', 'দুধ' 'বাঁশি'। এগুলো প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে নিয়ম মেনে প্রাকৃতের ভেতর দিয়ে এসেছে বাঙলায়। 'চাঁদ' ছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতে 'চন্দ্র', প্রাকৃতে ছিলো 'চন্দ'। বাঙলায় 'চাঁদ'। 'মাছ' ছিলো 'মৎস্য' সংস্কৃতে, প্রাকৃতে হয় 'মচ্ছ'। বাঙলায় 'মাছ'। 'এয়ো' ছিলো সংস্কৃতে 'অবিধবা'। প্রাকৃতে হয় 'অবিহবা'। বাঙলায় 'এয়ো'। 'দুধ' ছিলো সংস্কৃতে 'দুগ্ধ''; প্রাকৃতে হয় 'দুদ্ধ'। বাঙলায় হয় 'দুধ'। 'বাঁশি' ছিলো 'বংশী' সংস্কৃতে। প্রাকৃতে হয় 'বংসী'। বাঙলায় 'বাঁশি'। বেশ নিয়ম মেনে, অনেক শতক পথ হেঁটে এসেছে এ-তীর্থযাত্রীরা। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়রা।

আরো আছে কিছু তীর্থযাত্রী, যারা পথ হেঁটেছে আরো বেশি। তারা অন্য ভাষার। তারা প্রথমে ঢুকেছে সংস্কৃতে, তারপর প্রাকৃতে। তারপর এসেছে বাঙলায়। এরাও তদ্ভব শব্দ। মিশে আছে বাঙলা ভাষায়।

'খাল' আর 'ঘড়া'। খুব নিকট শব্দ আমাদের। 'খাল' শব্দটি তামিল ভাষার 'কাল' থেকে এসেছে। 'কাল' সংস্কৃতে হয় 'খল্ল'। প্রাকৃতে হয় 'খল্ল'। বাঙলায় 'খাল'। তামিল-মলয়ালি ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'কুটম'। সংস্কৃতে সেটি হয় 'ঘট'। প্রাকৃতে হয় 'ঘড়'। বাঙলায় 'ঘড়া'।

'দাম' আর 'সুড়ঙ্গ'। প্রতিদিনের শব্দ আমাদের। 'দাম' শব্দটি এসেছে গ্রিক ভাষার 'দ্রাখ্‌মে' (একরকম মুদ্রা, টাকা) থেকে। 'দ্রাখ্‌মে' সংস্কৃতে হয় 'দ্রম্য'। প্রাকৃতে 'দম্ম'। বাঙলায় 'দাম'। গ্রিক ভাষায় একটি শব্দ ছিলো 'সুরিংক্‌স্‌'। শব্দটি সংস্কৃতে ঢুকে হয়ে যায় 'সরঙ্গ'/'সুরুঙ্গ'। প্রাকৃতেও এভাবেই থাকে। বাঙলায় হয়ে যায় 'সুড়ঙ্গ'।

AMARBOI.COM

'ঠাকুর'। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ কবির নামের অংশ। শব্দটি ছিলো তুর্কি ভাষায় 'তিগির'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে হয়ে যায় 'ঠক্কুর'। বাঙলায় 'ঠাকুর'।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃত ভাষার বেশ কিছু শব্দ বেশ অটল অবিচল। তারা বদলাতে চায় না। শতকের পর শতক তারা অক্ষয় হয়ে থাকে। এমন বহু শব্দ, অক্ষয় অবিনশ্বর শব্দ, এসেছে বাঙলায়। এগুলোকে বলা হয় তৎসম শব্দ। বাঙলা ভাষায় এমন শব্দ অনেক। তবে এ-শব্দগুলো যে একেবারে বদলায় নি, তাও নয়। এদের অনেকে পরিবর্তিত হয়েছিলো, কিন্তু আমরা সে-পরিবর্তিত রূপগুলোকে বাদ দিয়ে আবার খুঁজে এনেছি খাঁটি সংস্কৃত রূপ।

জল, বায়ু, আকাশ, মানুষ, গৃহ, কৃষ্ণ, অন্ন, দর্শন, দৃষ্টি, বংশী, চন্দ্র এমন শব্দ। এদের মধ্যে 'বংশী' ও 'চন্দ্র'র তদ্ভব রূপও আছে বাঙলায়। 'বাঁশি' আর 'চাঁদ'। পুরোনো বাঙলায় 'সসহর' ছিলো, 'রএণি' ছিলো। এখন নেই। এখন আছে সংস্কৃত শব্দ 'শশধর' আর 'রজনী'। বাঙলা ভাষার জন্মের কালেই প্রবলভাবে বাঙলায় ঢুকতে থাকে তৎসম শব্দ। দিন দিন তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো প্রবল হয়ে ওঠে। উনিশশতকে তৎসম শব্দ বাঙলা ভাষাকে পরিণত করে তার রাজ্যে।

কিছু শব্দ বেশ রুগ্নভাবে এসেছে বাঙলায়। প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা সংস্কৃতের কিছু শব্দ কিছুটা রূপ বদলে ঢুকেছিলো প্রাকৃতে। তারপর আর তাদের বদল ঘটে নি। প্রাকৃত রূপ নিয়েই অবিকশিতভাবে সেগুলো এসেছে বাঙলায়। এগুলোকেই বলা হয় অর্ধতৎসম। 'কেষ্ট' ও 'রাত্তির' অর্ধতৎসম। 'কৃষ্ণ' ও 'রাত্রি' বিকল হয়ে জন্মেছে 'কেষ্ট ' ও 'রাত্তির'। শব্দগুলো বিকলাঙ্গ। মার্জিত পরিবেশে সাধারণত অর্ধতৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয় না।

আরো কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর মূল নির্ণয় করতে পারেন নি ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তবে মনে করা হয় যে বাঙলা ভাষার উদ্ভবের আগে যে-সব ভাষা ছিলো আমাদের দেশে, সে-সব ভাষা থেকে এসেছে ওই শব্দগুলো। এমন শব্দকে বলা হয় 'দেশি' শব্দ। এগুলোকে কেউ কেউ বিদেশি বা ভিন্ন ভাষার শব্দের মতোই বিচার করেন। কিন্তু এগুলোকেও গ্রহণ করা উচিত বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দ হিশেবেই। ডাব, ডিঙ্গি, ঢোল, ডাঙ্গা, ঝোল, ঝিঙ্গা, ঢেউ এমন শব্দ। এগুলোকে কী ক'রে বিদেশি বলি?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন ভাষার শব্দ

কোনো ভাষারই চলে না শুধু নিজের শব্দে। দরকার পড়ে অন্য ভাষার শব্দ। কখনো ঋণ করতে হয় অন্য ভাষার শব্দ। কখনো অন্য ভাষার শব্দ জোর ক'রে ঢুকে পড়ে ভাষায়। জোর যার তারই তো সাম্রাজ্য। শুধু নিজের শব্দে চলে নি বাঙলা ভাষার। ঋণ করতে হয়েছে তাকে বিভাষি, অন্য ভাষার, শব্দ। আবার অনেক সময় প্রচণ্ড কোনো ভাষার শব্দ জোর ক'রে ঢুকেছে বাঙলা ভাষায়, যেমন ঢোকে বিদেশি সেনাবাহিনী। বাঙলায় প্রবেশ করেছে ফারসি শব্দ, ঢুকেছে আরবি শব্দ, ঢুকেছে পর্তুগিজ, ফরাশি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার শব্দ। অনেক শব্দ বাঙলা ভাষা নিয়েছে আপন দরকারে, অনেক শব্দ নিয়েছে নিরুপায় হয়ে। প্রতাপশালী ওই সমস্ত শব্দকে প্রতিরোধ করতে পারে নি অসহায় বাঙলা ভাষা। অন্য ভাষার বহু শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বাঙলা শব্দের সাথে। পণ্ডিত ছাড়া অন্যরা জানেও যে ওই শব্দগুলো বাঙলা নয়। আমিও ক-বছর আগে জানতাম না 'সবুজ' বাঙলা নয়। 'ফসল' বাঙলা নয়। 'জমি' বাঙলা নয়। 'ফিতা' বাঙলা নয়। বাঙলা নয় 'মাস্তুল', 'তামাক', 'পেয়ারা', 'আলকাতরা', 'পাঁজা','কাগজ','জাহাজ', 'কাঁচি', 'শবরি' আর 'তুফান'। এবং আরো বহু শব্দ।

বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করেছে প্রধানত ফারসি ও ইংরেজি শব্দ। ফারসি ভাষার মধ্য দিয়ে ঢুকেছে কিছু তুর্কি ও বেশ কিছু আরবি শব্দ। ঢুকেছে কিছু পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দ। অন্যান্য ভাষার শব্দও পাওয়া যায় গুটিকয়। তবে সবচেয়ে বেশি ঢুকেছে ফারসি ও ইংরেজি। ইংরেজি এখনো প্রবলভাবে ঢুকছে বাঙলায়।

বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দ প্রবেশের কারণ বাঙলাদেশে মুসলমান শাসন। তেরো শতক থেকে আঠারো শতকের শেষভাগ পর্যন্ত মুসলমানেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন করে বাঙলাদেশ। রাজভাষা ছিলো ফারসি। তাই প্রচুর ফারসি শব্দ, ও ফারসি শব্দকে আশ্রয় করে আরবি ও তুর্কি শব্দ অনুপ্রবেশ করে বাঙলা ভাষায়। বাঙলা ভাষায় আছে আড়াই হাজারের মতো ফারসি-আরবি-তুর্কি শব্দ। পুরোনো বাঙলায় কোনো ফারসি-আরবি শব্দ ছিলো না। কিন্তু মধ্যযুগের শুরুতেই বাঙলায় প্রবেশ করে ফারসি শব্দ। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"-এ কয়েকটি ফারসি শব্দ—কামান, মজুরি, মজুরিআ, খরমুজা—পাওয়া যায়। ষোলো শতক থেকে বাড়তে থাকে বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রতাপ; এবং আঠারো শতকে তা চরমরূপ লাভ করে। উনিশ শতকের প্রথমভাগেও বেশ প্রভাবশালী ছিলো ফারসি শব্দ। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "কলিকাতা কমলালয়"(১২৩০) গ্রন্থে খুব দুঃখ করেছিলেন বাঙলা ভাষায় ফারসি শব্দের আধিপত্যে। তিনি একটি তালিকা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে ফারসি (ও আরবি) শব্দ কীভাবে সরিয়ে দিয়েছে তৎসম ও তদ্ভব বাঙলা শব্দকে। তাঁর তালিকায় দেখা যায় 'কল', 'কলম','কম','খরচ', 'খারাব', 'খুব'-এর মতো বহু শব্দ (এগুলোর বাঙলা 'যন্ত্র', 'লেখনী', 'অল্প', 'ব্যয়','মন্দ', 'উত্তম') অধিকার করেছে বাঙলা শব্দের স্থান।

'কিনারা' 'গ্রেফতার', 'দেয়াল', 'আয়না', 'মামলা' এসেছে ফারসি থেকে। 'কিনারা', ফারসিতে ছিলো 'কিনারাহ', 'গ্রেফতার' ফারসিতে ছিলো 'গিরিফতার','দেয়াল' ফারসিতে ছিলো 'দিওয়াল', 'আয়না' ফারসিতে ছিলো 'আইনাহ্', 'মামলা' ফারসিতে ছিলো 'মুআমলাহ্'। আরো কতো ফারসি শব্দ একটুকু রূপ বদলে বাঙলা হয়ে গেছে।

'কবুল', 'কলম', 'জৌলুস', 'তুফান', 'মরসিয়া' এসেছে আরবি থেকে। বাঙলায় এদের উচ্চারণ বদলে গেছে। বাঙলা অক্ষরে শব্দগুলোর মূল আরবি রূপ দেখানো একটু কঠিন। 'কবুল' এসেছে আরবি 'কবূল' থেকে। 'কলম' এসেছে আরবি 'কলম' থেকে। আরবি 'জুলুস' থেকে এসেছে 'জৌলুস', আরবি 'টুফুন' থেকে এসেছে 'তুফান'। 'মরসিয়া' শব্দটি আরবি থেকে ফারসি হয়ে বাঙলায় এসেছে। আরবিতে শব্দটি ছিলো 'মরথিয়া', ফারসিতে ও বাঙলায় 'মরসিয়া'। 'কলম' শব্দটি মূলে ছিলো গ্রিক। তখন তার রূপ ছিলো 'কলমোস'। আরবিতে হয় 'কলম'। বাঙলায় 'কলম'। 'টুফুন' আসলে চীনা শব্দ। চীনা 'তাইফাং' জাপানিতে হয় 'তাইফুন'; আরবিতে হয় 'টুফুন', ফারসিতে হয় 'তুফান'। বাঙলায় 'তুফান'।

সুনীতিকুমার বলেছেন বাঙলায় তুর্কি শব্দ চল্লিশটির বেশি হবে না। 'আলখাল্লা', 'কুলী', 'কোর্মা', 'খাতুন', 'বেগম', 'লাশ' তুর্কি শব্দ। 'আলখাল্লা' তুর্কিতে ছিলো 'আল খালিক'। 'কুলী' ছিলো 'কুলি', তখন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থ ছিলো 'ক্রীতদাস'। 'কোর্মা' তুর্কিতে ছিলো 'কওউর্মা'। 'খাতুন' ছিলো 'খতুন','বেগম' ছিলো 'বেগুম'। 'লাশ' ছিলো 'লাস'। কেমন আপন হয়ে গেছে এগুলো।

বাঙলা ভাষায় একশো থেকে একশো দশটির মতো আছে পর্তুগিজ শব্দ। আছে গুটিকয় ওলন্দাজ ও ফরাশি শব্দ। ইংরেজি শব্দের কোনো হিশেব-নিকেশ নেই। দিন দিন ইংরেজি শব্দ অনুপ্রবেশ করছে বাঙলায়। শুধু ঢুকছেই না; ইংরেজি শব্দ আমাদের বাধ্য করছে নতুন বাঙলা শব্দ তৈরি করতে, যাতে আরো ইংরেজি ভাব প্রকাশ করতে পারি বাঙলা শব্দে। বাঙলা ভাষায় ইংরেজি শব্দ কতো আছে, তা কেউ জানে না।

'আনারস', 'পিস্তল','ছায়া', 'কামরা', 'বালতি', 'পেঁপে' পর্তুগিজ শব্দ। 'আনারস' পর্তুগিজে ছিলো 'অননস'। 'পিস্তল' ছিলো 'পিস্তোল'। 'সায়া' (মেয়েদের পোশাক) পর্তুগিজে ছিলো 'সইঅ'। 'কামরা' ছিলো 'কমর'। 'বালতি' পর্তুগীজে ছিলো 'বলদে'। 'পেঁপে' ছিলো 'পপইঅ'।

ইংরেজি শব্দের কোনো হিশেব নেই। গুটিকয় ইংরেজি শব্দ তুলে দিচ্ছি। অফিস পালিশ কলেজ গর্বনমেন্ট হারিকেন ডজন শার্ট রোড ফটো কোর্ট চেয়ার আস্তাবল ইস্টিমার কেটলি লাট। বহু শব্দ বাঙলা ভাষায় গঠিত হয়েছে ইংরেজি শব্দের অনুসরণে। এমন কয়েকটি শব্দ : 'মন্ত্রীসভা' (কেবিনেট),'সভাপতি' (চেয়ারম্যান),'পরমাণু' (অ্যাটম), 'ভূগোল' (জিওগ্রাফি), 'অণুবীক্ষণ' (মাইক্রোস্কোপ), 'দূরবীক্ষণ' (টেলিস্কোপ), 'ছায়াপথ' (মিল্কিওয়ে), বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিভার্সিটি), 'সিন্ধুঘোটক' (হিপোপটমাস), 'লোহিতসাগর' (রেডসি), 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (কেপ অফ গুড হোফ), 'বাতিঘর' (লাইটহাউস), 'পাদপ্রদীপ' (ফুটলাইট), 'সংবাদপত্র' (নিউজপেপার)। এখন নিত্য নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে ইংরেজি শব্দের অনুসরণে। তাই বাঙলা ভাষা এখন ইংরেজির আত্মা খানিকটা বহন করে নিজের শরীরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষার ভূগোল

বাঙলা ভাষা কি একটি? যখন বলি 'বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা', তখন মনে হয় পৃথিবীতে একটি ভাষা রয়েছে, যার নাম বাঙলা। ওই ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু বাঙলা ভাষা কি একটি? নাকি অনেক? এক সময় একটি সাধু বাঙলা ভাষা ছিলো। 'কিয়দ্দিনান্তর রাজা মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন জগদীশ্বর আমাকে নানা জনপদের অধিপতি করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিত চিন্তার ভার দিয়াছেন।' এটা সাধুভাষা। এ-বাক্যটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। সাধুভাষার একটি গৃহীত রূপ ছিলো। ওই রূপটি সর্ববঙ্গীয়। কিন্তু সাধুভাষাই কি বাঙলা ভাষা? এরপর আরেকটি রূপ পাই বাঙলা ভাষার। তার নাম চলতি ভাষা বা চলতি বাঙলা। এখন বই লেখা হয় চলতি ভাষায়। মার্জিত পরিবেশে এখন আমরা চলতি ভাষায়ই কথা বলি। কিন্তু চলতি ভাষাই কি বাঙলা ভাষা? এটা তো বাঙলা ভাষার একটি মার্জিত রূপ। সব বাঙালি চলতি ভাষা বোঝে না। বলতে পারে না। বিক্রমপুরের চাষী বোঝে না চলতি বাঙলা। বলতে পারে না চলতি বাঙলা। এমনকি সব শিক্ষিত ব্যক্তিও ঠিক মতো বলতে পারে না চলতি বাঙলা। কিন্তু বাঙালি মাত্রই তো কথা বলে বাঙলা ভাষায়। মানভূমের চাষী, বিক্রমপুরের জেলে বাঙলা বলে। বাঙলা বলে সিলেটের মাঝি আর বাঁকুড়ার শবজিঅলা। চট্টগ্রামের শাম্পানঅলা বাঙলা বলে, বাঙলা বলে যশোরের ঘরের বউ। তারা কোন বাঙলা বলে? তারা কোন বাঙলা বোঝে? বাঙলা ভাষার কতো রূপ?

বাঙলা ভাষা প্রচলিত বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে। সম্ভবত আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যার কিছু কিছু অংশেও প্রচলিত বাঙলা ভাষা। কোটি কোটি মানুষের ভাষা বাঙলা। একটি বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় সীমাবদ্ধ বাঙলা ভাষা। বাঙলা ভাষার পশ্চিম সীমায় বাঙলা ভাষা মিশে গেছে ওড়িয়া, মগহি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৈথিলির সাথে। উত্তরপুবে মিশে গেছে অসমিয়া বা আসামির সাথে। বাঙলা ভাষার সীমাঞ্চলে এটি মিশেছে কয়েকটি আদিবাসী ভাষার সাথে। পশ্চিমে বাঙলা ভাষা ছোটোনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত; পুবে বিস্তৃত আসাম অবধি। বঙ্গোপসাগরের পুব উপকূল দিয়ে বাঙলা ভাষা প্রসারিত উত্তর ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত; আর দক্ষিণে আকিয়াবে বাঙলা ভাষা মেশে ব্রহ্মী ভাষার সাথে। হুগলি নদীর মোহানা থেকে বাঙলা ভাষার দক্ষিণ সীমা উত্তর-পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর জেলার ভেতর দিয়ে চ'লে যায়। পশ্চিমে বাঙলা ভাষার সীমা সিংভূম জেলার ভেতর দিয়ে চ'লে গেছে। এখানে বাঙলা ভাষা মুখোমুখি হয় কয়েকটি মুণ্ডা ভাষার। সেখান থেকে বাঙলা ভাষার পশ্চিম সীমা উত্তরপুব দিকে বাঁক নিয়ে রাজমহলের কাছে গঙ্গানদী পার হয়। মহানন্দা নদী ধ'রে বাঙলা ভাষার সীমা মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে প্রায় নেপালের সীমাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছোয়। বাঙলা ভাষার উত্তর সীমা দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার তরাইর উত্তর দিয়ে পুবে আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এসে নিজের পুব সীমার সাথে মেশে। আজ থেকে আশি বছর আগে বাঙলা ভাষার এ-সীমা নির্দেশ করেছিলেন জর্জ গ্রিয়ারসন।

বেশ বড়ো এলাকা জুড়েই তো মানুষেরা বলে বাঙলা ভাষা। কিন্তু সবাই এক অভিন্ন অনন্য বাঙলা বলে না। তারা যা বলে তার মধ্যে মিল আছে, কিন্তু অবিকল মিল নেই। এমনকি এক এলাকার বাঙলা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হ'তে পারে আরেক এলাকার লোকের কাছে। বিক্রমপুরের চাষীর ভাষা বুঝবে না বীরভূমের চাষী। আমি নিজেই তো বুঝি না সিলেটের বা চট্টগ্রামের বাঙলা। তবু বীরভূমের বাঙলাও বাঙলা। সিলেটের বাঙলাও বাঙলা। বিক্রমপুরের মাঠের রাখালের ভাষাও বাঙলা। বাঙলা ভাষা-এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে আছে বাঙলা ভাষার বিভিন্ন রূপ। ওই রূপগুলোকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। আঞ্চলিক ভাষাকে বলা হয় উপভাষা। তা যেনো মূল ভাষা নয়, তা উপভাষা। কিন্তু বাঙলা যারা বলে, তাদের অধিকাংশই বলে উপভাষা। চলতি বাঙলা খুব কম লোকই বলে। বহু উপভাষা আছে বাঙলা ভাষার।

প্রত্যেকেই খুব ভালোবাসে নিজের উপভাষা। অনেকে তো মনে করে তার উপভাষার মতো সুন্দর আর মিষ্টি কিছু নেই। কিন্তু অন্যরা তা মনে করে না। আমার কাছে যে-উপভাষা খুব মিষ্টি, আরেকজনের কাছে তা হ'তে পারে উপহাসের বস্তু! তাই উপভাষা নিয়ে উপহাস করার চল আসে সারা পৃথিবীতেই। যেমন বিক্রমপুরের উপভাষা হাসির বিষয় হয়েছিলো দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নাটকে। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালির ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে মজা করে অনেকেই। সিলেটের উপভাষা নিয়ে তো সকলের মস্ত মজা। এমনকি মধ্যযুগেও সিলেটের উপভাষা নিয়ে কৌতুক করেছিলেন পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য। *চৈতন্যভাগবত* নামক জীবনীগ্রন্থে ষোড়শ শতকে কবি বৃন্দাবন দাস লিখেছেন :

সভার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া॥
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সে মত বচন বলিয়া॥

প্রথমেই কানে বাজে উপভাষার উচ্চারণ। কী সুন্দর টানই না থাকে এক একটি উপভাষায়। কী মধুর বরিশালি টান। কী রসালো নোয়াখালি টান। আর কেমন কোলাহল সিলেটিতে চট্টগ্রামিতে। তারপরেই শব্দ। চমৎকার চমৎকার শব্দ পাওয়া যায় বিভিন্ন উপভাষায়। ওই সব শব্দের অনেকগুলোই নেই চলতি ভাষায়। শর্দি লাগলে নাক দিয়ে ঘন যা বেরোয়, তার কোনো নাম নেই চলতি ভাষায়। আমরা বলতাম 'হিঙ্গইল'। সুরুচির চাপেই বোধ হয় চলতি ভাষায় নেই এমন কোনো শব্দ। ওই ঘনবস্তু নাকে শুকিয়ে গেলে, যা হয়, তার কোনো নাম নেই চলতি ভাষায়। আমরা বলতাম 'বষ্টি'। কী চমৎকার! কিন্তু চলতি ভাষায় নেই। বর্ষায় সারা মাঠে যখন নেমে আসতো শান্তি আর স্তব্ধতা, বাতাসে যখন একটি ধানের ডগাও কাঁপতো না, ওই অবস্থাকে বলতাম 'নিরাক'। শহরে ওই নিরাক নেই, নিরাক পড়ে না। তাই চলতি বাঙলায়ও 'নিরাক' নেই।

কোনো একটা জায়গা থেকে একটু উত্তরে, কিছুটা পুবে, সামান্য দক্ষিণে, অল্প পশ্চিমে গেলেই দেখা যায় ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে উচ্চারণ। বদলে যাচ্ছে টান। এক সময়, বেশ দূরে গিয়ে, মনে হয় উচ্চারণ বা টান বেশ ভিন্ন হয়ে গেছে। মনে হয় এসে গেছি আরেকটি উপভাষা এলাকায়। তেমনি বদলে যায় শব্দ। বাঙলায় নাকি একটি চলতি কথা আছে যে প্রতি দশ ক্রোশে, বিশ মাইলে, বদলে যায় ভাষা। একেবারে বদলে যায় না, তবে বদলে যায় অনেকখানি। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে গেলেই দেখা যায় কোনো কোনো জিনিশের নাম ভিন্ন হয়ে গেছে। কোনো কোনো ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে ভিন্ন শব্দে। আমাদের গ্রামে একটি জিনিশকে আমরা বলতাম 'আইল্লা'। 'আইল্লা' একটি মাটির পাত্র, যাতে আগুন রাখা হয়। গ্রামের মানুষেরা আগুন জমিয়ে রাখে আবার আগুন ধরানোর জন্যে। শীত লাগলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ে শেক দেয়ার জন্যে। কতোদিন শীতকালে আমরা 'আইল্লা' পুহিয়েছি। আমাদের গ্রাম থেকে একটু পশ্চিমে কামারগাঁয়ে 'আইল্লা'র নাম ছিলো 'মালশা'। আমরা হাসতাম 'মালশা' শুনলে। ওরা হাসতো 'আইল্লা' শুনলে। আরো কতো শব্দ ভিন্ন ছিলো রাড়িখালে আর কামারগাঁয়ে। এক মাইলের ব্যবধানে। তাই সারা বাঙলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চারণে, শব্দে, বাক্য তৈরির কৌশলে অনেক ভিন্নতা। কিন্তু এ-সব উপভাষাই বাঙলা ভাষা।

বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে আছে বহু বহু উপভাষা। আঞ্চলিক ভাষা। য়্যাকঝোন্ মানুসের দুটা ব্যাটা আছ্লো। এটা মালদহের বাঙলা। য়াকজনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। এটা মাণিকগঞ্জের বাঙলা। এক বেডার দুই পুৎ আচিল্। এটা ত্রিপুরার বাঙলা। অ্যাকজোন মান্শির দুই ছওল ছিলো। এটা বাগেরহাটের বাঙলা। এক ঝন্কার দুইঝন্ বেটা আছিল্। এটা জলপাইগুড়ির বাঙলা। একঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল্। এটা বগুড়ার বাঙলা। কোন মানুষের দুই পুয়া আছিল। এটা সিলেটের বাঙলা। একজন মান্ষের দুগুয়া পুয়া আছিল। এটা কাছাড় জেলার বাঙলা। একজনের দুট ছল ছিল। এটা যশোরের বাঙলা। এগুআ মান্স্যের দুয়া পোয়া আছিল্। এটা চট্টগ্রামের বাঙলা। আছে এমন অঞ্চল অঞ্চলের বাঙলা ভাষা। এগুলোর মধ্যে মিল আছে, অমিলও আছে। তাই সারা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে একই রকম ধ্বনি উচ্চারিত হয় না বাঙলা ভাষার। একই শব্দে প্রকাশ পায় না মনের ভাব। প্রতিদিন বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে মুখর হয়ে ওঠে বিভিন্ন রকম বাঙলা। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙলা। বিভিন্ন উপভাষা। যে-চলতি বাঙলা বলার চেষ্টা করি শোভন পরিবেশে শোভন মানুষেরা, তা বাঙলা ভাষার একটি শোভন রূপ।

বাঙলা ভাষার উপভাষা কতোগুলো? কে জানে! সেগুলো কীভাবে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অঞ্চলে? কে জানে! তবে এমন প্রশ্ন উঠলে মনে পড়ে একজন বিদেশির নাম। তিনি জর্জ আব্রাম গ্রিয়ারসন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশরাজের উচ্চপদস্থ আমলা। গ্রিয়ারসন জরিপ করেছিলেন ভারতের উপভাষাগুলো। জরিপ করেছিলেন বাঙলা উপভাষাগুলো। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "লিংগুইস্টিক সারভে অফ ইন্ডিয়া" নামক এগারো খণ্ডে সম্পূর্ণ জরিপের পঞ্চম খণ্ড : প্রথম ভাগে আছে বাঙলা উপভাষার পরিচয়। এ-গ্রন্থে আছে বিভিন্ন বাঙলা উপভাষার নমুনা। গ্রিয়ারসন শুধু নমুনা সংগ্রহ করেন নি, তিনি বাঙলা উপভাষাগুলোকে বিভিন্ন ভাগেও সাজিয়েছিলেন। যে-সব উপভাষার মধ্যে মিল বেশি সেগুলোকে ভাগেভাগে সাজিয়েছিলেন গ্রিয়ারসন। তাঁর পর আর কেউ বাঙলা উপভাষার এমন জরিপ করেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো প্রায় সবাই তার বই থেকেই সংগ্রহ করেন বাঙলা উপভাষার নমুনা। যদিও গত আশি বছরে এ-সমস্ত উপভাষারও ঘটেছে নানা বদল।

গ্রিয়ারসন বাঙলা উপভাষাগুলোকে প্রথমে ভাগ করেন দুটি বড়ো শাখায়। এক শাখার নাম 'পাশ্চাত্য' অর্থাৎ পশ্চিমের শাখা। আরেক শাখার নাম 'প্রাচ্য' অর্থাৎ পুবের শাখা। পশ্চিম শাখার আছে আবার চারটি উপশাখা। এগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বা মান শাখা, দক্ষিণ-পশ্চিম শাখা, পশ্চিম শাখা, ও উত্তর শাখা। তাঁর পুব শাখার কেন্দ্রে আছে ঢাকা জেলার উপভাষা। পুব শাখাকে তিনি ভাগ করেছেন দুটি উপশাখায়। একটি প্রাচ্য বা পুব উপশাখা। অন্যটি দক্ষিণ-প্রাচ্য উপশাখা। তাঁর কেন্দ্রীয়, বা মান উপশাখায় পড়ে কলকাতা শহর ও চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও হাওড়া জেলা। পশ্চিম উপশাখায় আছে ছোটোনাগপুর, মানভূম ও ধলভূমের উপশাখা। দক্ষিণ-পশ্চিম উপশাখায় আছে মেদেনীপুর। উত্তর উপশাখায় পড়ে দিনাজপুরের উপভাষা। তাঁর পুব শাখার পুব উপশাখায় পড়ে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, সিলেট ও কাছাড়। দক্ষিণ-প্রাচ্য উপশাখায় আছে নোয়াখলি ও চট্টগ্রামের ভাষা। এভাবে উপভাষাগুলোকে ভাগ করেছিলেন গ্রিয়ারসন। এখন নতুনভাবে ভাগ করলে হয়তো উপভাষার ভিন্ন ভূগোল পেতে পারি আমরা।

গ্রিয়ারসন সংগ্রহ করেছিলেন বহু উপভাষার নমুনা। বাইবেলের একটি গল্প রূপায়িত করেছিলেন তিনি বিভিন্ন বাঙলা উপভাষায়। তাই তাঁর গ্রন্থে বাঙলা উপভাষার বিভিন্ন নমুনা পাওয়া যায়। ওই গল্প ছাড়া কিছু গল্প ও গান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর গ্রন্থ বাঙলা উপভাষার খনির মতো। কয়েকটি নমুনা এমন :

সাধুভাষা : কোন এক ব্যক্তির দুটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে কনিষ্ঠটী তাহার পিতাকে কহিল পিতঃ বিষয়ের যে অংশ আমার প্রাপ্য তাহা আমাকে দিন। তিনিও উহাদের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই কনিষ্ঠ পুত্রটী সমস্ত একত্র করিয়া এক দূর দেশে যাত্রা করিল, এবং তথায় অপরিমিত আচারে তাহার বিষয় অপচয় করিয়া ফেলিল।

কলকাতার (নারীদের) উপভাষা : এক জনের দুই ছেলে ছেল। তাদের যে ছোট, সে তার বাপকে বল্লে, বাবা, আমার ভাগে যা পড়ে তা আমাকে দাও। বাপ তার বিষয় আশয় তাদের বেঁটে দিলে। দিন কতক পরে ছোট ছেলে তার সমস্ত জিনিস পত্তর নিয়ে দূর দেশে চলে গেল; সেখানে বদফেয়ালি করে সমস্ত উড়িয়ে দিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওড়ার উপভাষা : কোন লোকের দুটি ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটি তার বাপকে বল্লে, বাবা, আমার ভাগে বিষয়ের যা পড়ে তা আমাকে দিন। তাতে সে তার বিষয় তাদিকে ভাগ করে দিলে। অল্প দিন পরে ছোট ছেলে তার অংশের সব বিষয় একত্তরে জড় করে নিয়ে দূর দেশে চলে গেল, আর সেখানে বদ-ফেয়ালি করে সর্বস্ব উড়িয়ে দিল।

মেদেনীপুরের উপভাষা : এক লোক্‌কার দুটা পো থাইল। তান্নেকার মাঝু কোচ্যা পো লিজের বাফুকে বল্ল বাফুহে! বিষৈ আশের যে বাটী মুই পাব সেটা মোকে দ্যা। সে তান্নাকার মাঝু বিষৈ বাটী কোর‍্যা দিল। ভোৎ দিন যাইনি কোচ্যা পো সমুচ্যা গুটি লিয়া ভোৎ দূরে এক গাঁয়ে চোল্যা গ্যাল। সেঠি সে আকুত্তা খচ্চাপতর কোর‍্যা লিজের বিষৈ-আশৈ এক্কাদমে ফুক্কা-প্যাল্ল।

বগুড়ার উপভাষা : এক ঝনের দুই ব্যাটাছৈল আছিল। তারকেরে মধ্যে ছোটঝন কৈল বা হামি যা পামু তা হামাক বাঁট্যা দে। তাই শুনে বাপে বাঁট্যা দিল। ছোটঝন বাঁট্যা লেওয়ার কদিন পর ভিন দেশে গেল। সেটী যায়্যা লাঠামো কর‍্যা টাকাকড়ি উড়্যা দিল।

পাবনার উপভাষা : কোনো মানুষের দুই ছাওয়াল ছিল। তার মধ্যি ছোডোটা বাপেক কোলো, বাবা জিনিশ পত্তোরের পাওয়ানা ভাগ আমাক গুনে দ্যাও। ইয়েই শুনে, তার বাপ্‌ তার নিজির জিনিশ পত্তোর বাঁট্যা দিলো। অল্প দিন পরে ছোডো ছাওয়াল সকল জিনিশ পত্তোর জড়ো কর‍্যা দূর দ্যাশে যাত্তারা করলো। এবং সেখানে বদ্‌কাম্‌ কর‍্যা নিজির বিষেয় আসেয় উড়্যায়ে দিলো।

মাণিকগঞ্জের উপভাষা : য়্যাক জনের দুইডী ছাওয়াল আছিলো। তাগো মৈদ্দে ছোটডি তার বাপেরে কৈলো, বাবা, আমার ভাগে যে বিত্তি ব্যাসাদ্‌ পরে তা আমার দ্যাও। তাতে তিনি তান বিষয় সোম্পত্তি তাগো মৈদ্দে বাইটা দিল্যান। তারপর কিছুদিন পরে ঐ ছোট ছাওয়ালডি তার সগল টাকাকড়ি য়্যাকাত্র কইর‍্যা য়্যাক দূর দ্যাশে চইলা গ্যালো। সেখানে গিয়া তার যা কিছু আছিলো তার বদ্‌খ্যালী কৈরা উরাইয়া দিলো।

ময়মনসিংহের উপভাষা : এক জনের দুই পুৎ আছিল্‌। তার ছুডু পুতে বাপেরে কইলো বাজি! মাল ব্যাসাতের যে বখ্‌রা আমি পাইবাম্‌ তা আমারে দেউখাউন। হে তারারে মালপাতি বাট কৈরা দিল্‌। থুরা দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদে ছোট্‌কা তার হগ্‌গল মালব্যাসাৎ থুবাইয়া দূর মুল্লুকে গেল্‌। হেইখানে ফৈলামী কৈরা হগ্‌গল খোয়াইল।

নোয়াখালির উপভাষা : একজন মাইন্‌সের দুগা হোলা আছিল্‌। হিয়ার্‌ মধ্যে ছুডুগায় হেইতার বাফেরে কইল্‌ বায়াজি আঁর ভাগে মাল্‌ যিগিন্‌ হড়ে হিগিন্‌ আঁরে দেও। আর হেইতেও হেইতার ব্যাক্‌বিত্ত হোলাইনেরে ভাগ করি দিল্‌। হিয়ার কদিন বাদে ছোড হোলা ব্যাকগিন অত্তর্‌ করিলই এক দুবই এক দেশে বেড়াইত গেল; হিয়ানে হেইতে সণ্ডামি করি হেইতার ব্যাক বিত্ত উড়াই দিল্‌।

এমন বিচিত্র স্বর সুর টান আর রঙের ভাষা বাঙলা। অঞ্চলে অঞ্চলে তার আঞ্চলিক শোভা। এ-ভাষা নদীর ঢেউয়ে ছলকে ওঠে। কলাপাতার কম্পনে দুলে ওঠে। রাখালের মুখ থেকে মাঠে ময়দানে ঝ'রে পড়ে। পুকুরপাড়ে নতুন বউর মুখে মুখর হয়ে ওঠে। ক্রোধে গর্জন ক'রে ওঠে পদ্মার চরে। নানা স্বরে মুখরিত বাঙলা ভাষার ভূভাগ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আ কালো অ শাদা ই লাল

যখন 'আ' বলি তখন কি কোনো রঙ ভেসে ওঠে চোখের সামনে? কোনো রঙ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে 'অ' বললে? 'ই' বললে? 'উ' বললে? সবুজ নীল রঙ আছে কি 'ক'র 'খ'র 'গ'র? আমরা যারা খুব বাস্তব মানুষ তারা 'আ' বললে একটি ধ্বনি শুনি। 'ই' বললে আরেকটি ধ্বনি শুনি। কোনো রঙ ভেসে ওঠে না চোখের সামনে। কানে গুঞ্জন করে ধ্বনি। বাস্তব পেরিয়ে গিয়েছিলেন সবুজ চোখের এক কিশোর-তরুণ কবি। জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো। ফরাশি কবি। ওই কবি লিখেছিলেন : 'আবিষ্কার করেছি আমি স্বরবর্ণের রঙ! —আ কালো, অ শাদা, ই লাল, উ সবুজ।' তাঁর চোখে এক একটি ধ্বনি দেখা দিয়েছিলো এক একটি রঙ নিয়ে। ধ্বনি দেখা যায় না; কিন্তু লেখা যায়। একটি ধ্বনি আছে বাঙলায়, তার চিহ্ন 'অ'। আরেকটি ধ্বনি আছে, তার চিহ্ন 'ক'। আরো বহু ধ্বনি আছে, তাদের লেখা হয় একএকটি চিহ্নে। ওই চিহ্নগুলোকে আমরা বলি 'অক্ষর'। আবার কখনো বলি 'বর্ণ'। সবগুলো অক্ষরকে একত্রে বলি 'বর্ণমালা', বর্ণে বর্ণে গাঁথা মালা।

ছোটো বয়সে যখন অক্ষর বা বর্ণ শিখতে শুরু করি, তখন হাতে পাই কী সুন্দর সুন্দর বই! তাতে একএকটি বর্ণ কী বড়ো। আর কতো ছবি। 'অ'র পাশে অজগরের ছবি। 'আ'র পাশে ছবি রঙিন আমের। অক্ষরগুলো কত বড়ো আর কত রঙ বা বর্ণ তাদের। বাঙলায় আমরা অক্ষরকে বর্ণ বলি। বর্ণ শব্দের অর্থ 'রঙ'। সেই পুরোনো কালে যখন লেখা শুরু হয়েছিলো তখন বিভিন্ন রঙ দিয়ে আঁকা হতো অক্ষরগুলো। বর্ণ দিয়ে লেখা হতো অক্ষর। তাই অক্ষরের নাম হয় বর্ণ অর্থাৎ রঙ। পৃথিবীর বহু ভাষায় অক্ষর বোঝানোর জন্যে যে-শব্দটি আছে, তার অর্থ রঙ। বাঙলায়ও তাই। এখনো তো কতো রঙে চিত্রিত হয় অক্ষর। কালোতে, লালে। সবুজে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলে। কবি মধুসূদনের বর্ণনা ধার ক'রে বলতে পারি, আমাদের অক্ষরগুলো 'রঞ্জিত রঞ্জনরাগে'। অর্থাৎ রঙে রঙে রাঙানো।

আমাদের বর্ণগুলো কোথা থেকে এসেছে? চিরিদিনই কি এরা এরকম? চিরকালই কি বাঙালি এভাবেই লিখে আসছে বাঙলা ভাষা? বাঙলা অক্ষরগুলো কোণঅলা, অনেকটা ত্রিভুজের মতো। গোলগাল নয়। একএকটি অক্ষর ফলের মতো ঝুলে থাকে 'মাত্রা' থেকে। মাত্রা নেই এমন অক্ষর আছে মাত্র গুটিকয়। লেখার সময় ঘটে কতো ঘটনা। ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর চেহারা প্রায় সব সময়ই ঠিক থাকে। বেশি বদলায় না। কিন্তু স্বরবর্ণগুলোর রূপ বদলে যায় ঘন ঘন। ছিলো 'ই'; কিন্তু হয়ে যায় 'ি'। ছিলো 'আ'; কিন্তু হয়ে যায় 'া'। ছিলো 'উ'; কিন্তু হয়ে যায় 'ু'। ছিলো 'ও'; কিন্তু হয়ে যায় 'ো'। ছিলো 'ঔ'; কিন্তু হয়ে যায় 'ৌ'। আর এরা ব্যঞ্জনবর্ণের বাঁয়ে বসে। ডানে বসে। ওপরে বসে। নিচে বসে। বাঁয়ে-ডানে-ওপরে-নিচে ব'সে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণকে।

কোথা থেকে এসেছে এরা? ভারতের একটি প্রাচীন লিপির নাম ব্রাহ্মীলিপি। ভারতের মানুষের নানা অদ্ভুত বিশ্বাস ছিলো, এখনো আছে। অনেকে মনে করতো ওই ব্রাহ্মীলিপি একেবারে ব্রহ্মার সৃষ্টি। কিন্তু এ-লিপি কয়েক হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেছিলো ভারতবাসীরাই। এ-লিপির বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে বাঙলা লিপি বা অক্ষর বা বর্ণমালা। কেউ কেউ মনে করেন যে ষষ্ঠ শতকের দিকে বাঙলা, বিহার, ওড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো ওই লিপির একরকম বিবর্তিত রূপ। এ-রূপকে বলা হয় গুপ্তলিপির পূর্বদেশীয় রূপ। এ-গুপ্তলিপি আবার এসেছে কুষাণ লিপি থেকে। কুষাণ লিপি এসেছিলো ব্রাহ্মীলিপি থেকে। দশম শতকের দিকে ব্রাহ্মীলিপি বদলে হয়ে ওঠে বাঙলা লিপি। তারপর কতো বদল ঘটেছে বাঙলা লিপির। তখন তো ছাপাখানা ছিলো না। হাতে লেখা হতো পুথি। মানুষে মানুষে পার্থক্য ঘটে অক্ষরের রূপে। পুরোনো অক্ষরে পাওয়া যায় কতো রকমের অ, কতো রকমের আ, ক খ গ ঘ। হাতে হাতে বদলে আঠারো শতকের শেষ দিকে, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে, বাঙলা বর্ণমালা ঢালাই হয় ধাতুতে। মুদ্রাযন্ত্রে ওঠে বাঙলা অক্ষর। বই ছাপা শুরু হয় বাঙলা বর্ণমালায়। যন্ত্র তো নানা রকম করে না কোনো কিছুকে। যন্ত্রের কাজই সব কিছুকে সুশৃঙ্খল ক'রে তোলা। যন্ত্রে ওঠার পর থেকেই বাঙলা বর্ণ স্থির রূপ পায়। সব 'ক' হয়ে ওঠে একই রকম, সব 'খ'র চেহারা এক। তবে তা হ'তে কিছুটা সময় লেগেছিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে এ-দেশে ছাপাখানা ছিলো না। ইউরোপে পনেরোশতকে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাপাখানা বা মুদ্রাযন্ত্র। এ-দেশেও ছাপাখানা নিয়ে আসে ইউরোপীরা। ইউরোপীরাই প্রথম ছাপে বাঙলা বর্ণমালা। প্রথমে বাঙলা বর্ণমালা ছাপা হয়েছিলো ব্লকের সাহায্যে। বিদেশে। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম থেকে বেরিয়েছিলো *চায়না ইলাস্ট্রেটা* নামে একটি বই। ওই বইতে মুদ্রিত হয়েছিলো বাঙলা বর্ণমালার নমুনা। *অ্যালফাবেটুম বেংগুলিকুম* নামে এ-বইতে বাঙলা বর্ণের যে-তালিকা ছাপা হয়েছে, তা দেখতে অনেকটা কাকের পা বকের পা। ১৭৪৩-এ লাইডেন থেকে বেরিয়েছিলো "ডিসারতিও সিলেকটা" নামে একটি বই। এ-বইতে আছে বাঙলা বর্ণমালার নমুনা। খুব চমৎকার এ-অক্ষরগুলো। মুগ্ধ চোখে দেখতে হয়। আরো কয়েকটি বইয়ে ছাপা হয়েছিলো বাঙলা অক্ষর, ব্লকে বা ধাতুফলকে।

১৭৭৮। অবিস্মরণীয় বছর বাঙলা লিপি ও ভাষার ইতিহাসে। এ-বছর হুগলি থেকে বেরোয় বাঙলা ভাষার প্রথম বিস্তৃত ব্যাকরণ। ব্যাকরণরচয়িতা ন্যাথনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। বইটি লেখা ইংরেজিতে। কিন্তু হ্যালহেড তাঁর বইয়ের বাঙলা উদাহরণগুলো ছেপেছিলেন বাঙলা অক্ষরে। ওই উদাহরণ ছাপতে গিয়েই সূচিত হয় বাঙলা বর্ণমালার আধুনিক কাল। আগে ব্লকে ছাপা হয়েছিলো বাঙলা বর্ণমালা; আর গুটিকয় শব্দ। এবার ছাপতে হয় পুরো বাক্য। পাতার পর পাতা। বই ছাপতে দরকার হয় টাইপ, ধাতব অক্ষর। ধাতব বর্ণ। এক একটি পৃথক পৃথক। হ্যালহেডের *এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ*-এর জন্যে বানানো হয় ধাতব অক্ষর। অক্ষর বানান চার্লস উইলকিন্স। তাঁকে সাহায্য করেন একজন কর্মকার, পঞ্চানন কর্মকার। হ্যালহেডের বইয়ের জন্যে যে-টাইপ বানানো হয়েছিলো, তা ছিলো খুবই চমৎকার। তার বাঙলা বর্ণগুলো অত্যন্ত সুশ্রী। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। আকারে একটু বড়ো। কিন্তু কিছু অক্ষর এখনকার মতো নয়। কিন্তু উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারই অনেকটা চিরকালের জন্যে স্থির ক'রে দেন বাঙলা বর্ণের মুখের রূপ। এরপর মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনে ও উৎসাহে সুশ্রী থেকে সুশ্রীতর হয়ে উঠেছে বাঙলা অক্ষর। দেখা দিয়েছে মনো ও লাইনো রূপসী অক্ষর। তৈরি হয়েছে গুটিকয় নতুন অক্ষর। যুক্তাক্ষর নানাভাবে যুক্ত হয়েছে মনো ও লাইনোর শাসনে ও স্নেহে। তবু তাদের শরীরে ছোঁয়া লেগে আছে পঞ্চানন ও উইলকিন্সের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গদ্যের কথা

কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল। এটা কী? কবিতা। আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে। এটা কী? কবিতা। রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার ওপরে বসলো রাজা। এটা কী? কবিতা। জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে? এটা কী? কবিতা। ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়। এটা কী? কবিতা। আপণা মাংসে হরিণা বৈরী। এটা কী? কবিতা। কবিতায় ভ'রে আছে বাঙলা ভাষা। ছন্দে মিলে সাজানো শব্দগুচ্ছ : কবিতা বা পদ্য।

আমরা কেউ কবিতায় কথা বলি না। কথা বলার সময় ছন্দে মিলে সাজিয়ে দিই না ভাষা। রান্নাঘরে বেড়ালের লড়াই দেখে কেউ বলবে না : 'আম্মা আবার রান্না ঘরে বেড়াল ঢুকে লড়াই করে।' 'গরু' সম্পর্কে রচনা লিখতে দিলে কেউ লিখবে না : 'আমরা সকলেই ভালো ক'রে জানি। গরু আর ষাঁড় সব চতুষ্পদ প্রাণী। রাখালের আগে আগে ধীরেধীরে যায়। মাঠে গিয়ে খুশি হয়ে কতো ঘাস খায়।' এমন আজ আর কেউ লিখবে না। কিন্তু লিখতো তিনশো কি চারশো কি পাঁচশো বছর আগে। কেননা তখন গদ্যে কিছু লেখার কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। প্রায় সব কিছু লেখা হতো কবিতায় বা পদ্যে, ছন্দে-মিলে সাজিয়ে।

বাঙলা ভাষার আদি ও মধ্যযুগ ভ'রে ছিলো কবিতা। পদ্য। বাঙলা ভাষায় লেখা ওই সময়ের যা কিছু পাওয়া গেছে, তার শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি হচ্ছে পদ্য। তার মানে কি আগের মানুষ কথাও বলতো কবিতায়? পদ্যে? প্রতিটি বাঙালিই ছিলো তখন কবি? মাঠের রাখাল কবি, নদীর জেলে কবি? ঘরের বউ কবি? বাজারের মুদি কবি? নিশ্চয়ই এমন ছিলো না। তারা সকলেই কবি ছিলো না, তবে কেউ কেউ ছিলেন কবি। মানুষ তখন কথা বলতো গদ্যেই—সহজ সরল সাধারণ ভাব বিনিময় করতো না-সাজানো না-গোছানো শব্দে। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগলেই তাদের মনে দোলা দিতো ছন্দ, গুণগুণিয়ে উঠতো মিল। ওই পদ্যের একটা বড়ো অংশই অবশ্য গদ্যের মতো। কিছু অংশ তো গদ্যের চেয়েও গদ্য। গদ্য দরকার পড়ে প্রতিদিনের জীবন নির্বাহের জন্যে; বক্তব্য আর চিন্তা প্রকাশের জন্যে। আমাদের আদি ও মধ্যযুগের পূর্বপুরুষেরা প্রতিদিনের জীবন যাপন করতেন আটপৌরে গদ্যেই। কিন্তু তার কোনো উদাহরণ কালিতে কাগজে বাঁধা পড়ে নি। মুখ থেকে বেরিয়ে মুখর গদ্যভাষা মিশে গেছে অনন্তে। বক্তব্য আর চিন্তা প্রকাশের কোনো প্রয়োজন ছিলো না তাদের? যেমন প্রয়োজন এখন আমাদের? ছিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু তা আজকের বাঙালির প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। আর ওই প্রয়োজন মিটে যেতো গদ্যেরই যমজ বোন পয়ার ছন্দে।

এখন তো লিখিত বাঙলা ভাষার পঁচানব্বই ভাগই গদ্য। সহজ সরল, দুরূহ জটিল, শুদ্ধ অশুদ্ধ, সুন্দর অসুন্দর নানারকম গদ্যে পূর্ণ লিখিতমুদ্রিত বাঙলা ভাষা। গদ্যই বাঙলা ভাষা, এমনও মনে হয় অনেকের। বাঙলা ভাষার যখন জন্ম হচ্ছিলো, তখন কেউ গদ্য লেখে নি। মধ্যযুগের শুরুতেও যে গদ্য লেখা হয়েছিলো, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ষোলো শতকেই লিপিবদ্ধ হয় বাঙলা গদ্য। তবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার কোনো ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেনি। এ-সময়ে পাওয়া যায় নড়োবড়ো, বিকল, অদ্ভুত গদ্য। তখনকার বাঙলা গদ্য ও পদ্যের অবস্থা দেখে প্রশ্ন জাগে—যা হাঁটতেই শিখলো না তা এমন নাচ শিখলো কেমন ক'রে? পদ্য তখন নেচে চলেছে, গদ্য চলছে খুঁড়িয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে। ১৫৫৫ থেকে ১৭৪৩ পর্যন্ত সময়টা বাঙলা গদ্যের খুঁড়িয়ে চলার কাল। এ-সময়ে অনেক দলিলদস্তাবেজ, চিঠিপত্র লেখা হয়েছে গদ্যে; আর বৈষ্ণব সাধকদের কিছু কিছু গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ লেখা হয়েছে গদ্যে। খুবই গরিব এ-গদ্য। তবে তা বাঙালি গদ্য। কেননা এগুলো লিখেছিলেন মোটামুটিভাবে বাঙালিরাই। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে বিদেশিদের কলমে রচিত হয় বাঙলা গদ্য। এতোদিন যা দেশীয় রীতিতে খোঁড়াচ্ছিলো, ১৭৪৩-এ তাতে লাগে বিদেশি-পর্তুগিজ-খোঁড়ানোর ঢঙ। কিন্তু তখন বাঙলা গদ্য স্থির ক'রে ফেলেছে যে তাকে শক্তি আয় করতে হবে, সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। যেতে হবে অনেক দূর। দাঁড়াতে হবে দুপায়ে। পা ফেলতে হবে স্থিরভাবে। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বেশ স্থির হয়ে ওঠে গদ্য। তারপর দ্রুত আধশতকেই বাঙলা গদ্য এতো শক্তি আর পেশি অর্জন করে যে নাচ বন্ধ হয় বাঙলা ভাষার। দিকে দিকে ছন্দের নর্তকীরা নূপুর খুলে ফেলে। নৃত্যের কাল শেষ হয়েছে; শুরু হয়েছে পদযাত্রার কাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসামের তেজপুর থেকে প্রকাশিত "আসামবন্তি" পত্রিকায় ১৯০১ অব্দের জুন মাসের ২৭ তারিখে বাঙলা ভাষায় লেখা একটি চিঠি ছাপা হয়। চিঠিটি, ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে, লিখেছিলেন কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ, অহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের কাছে। এ-চিঠিতেই খচিত হয়ে আছে বাঙলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো গদ্যের রূপ। এর ভাষা আর ভাব দুই-ই বেশ সহজ সরল। পরে যে-ভাষাকে সাধুভাষা বলা হয় চিঠিটিতে তারই সূচনা ধরা পড়ে। চিঠিটির কিছু অংশ এমন :

> লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরি বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম।

রাজার কাছে রাজার লেখা রাজকীয় চিঠি এটি। সম্বোধনে একটি 'আপনি' এখানে প্রত্যাশা করি; কিন্তু এতে পাওয়া যায় 'তোমার'। তাই বোঝা যায় ষোলোশতকে রাজাদের কাছেও অপরিচিত ছিলো 'আপনি'। যে-সব চিঠিপত্র পাওয়া গেছে তাতে চোখে পড়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে সম্বোধন। আজকাল আমরা যেখানে 'প্রিয়', 'জনাব', ও প্রচণ্ড কাউকে সম্বোধন করতে গেলে বড়জোর 'মাননীয়' বা 'মহামান্য' লিখি সেখানে ওইসব পুরোনো চিঠিতে পাওয়া যায় লোমহর্ষক সব সম্বোধন। যাদের সম্বোধন করা হয়েছে ওইসব পত্রে, তারা কেউ 'প্রচণ্ড প্রতাপ', কেউ 'প্রবল প্রতাপ', কেউ 'মহোগ্র প্রতাপ', আবার কেউ 'গঙ্গাজল নিরমল পবিত্র কলেবর'। ১৭৮৮ অব্দে লেখা এক আবেদনপত্রের রোমহর্ষক ও নিরর্থক সম্বোধন এমন :

> স্বস্তি প্রাতরুদীয়মানার্কমণ্ডল নিজভুজবল প্রতাপতাপিত সক্রসমূহ পূজিতাখীল রাজ্যেশ্বর মহামহিম শ্রীযুত মশীরাখাষ হুজুর সুলতানল গোলেস্তান ও বুনিয়ান জব্বয়েণ আজীমঃশান শেফাহসালার আফোআজ বাদসাহি ও কম্পেনী কেশওরে হিন্দোস্থান গবনর জনরেল চারলষ লাট করণওালশ বাহাদোর বিশম শমরাট বৈরীকুল করিকুম্ব বিদারণ কেশরীবর মহোগ্র প্রতাপেষু।

কী করা যাবে। প্রচণ্ড প্রতাপেরা সিংহাসন আর সম্বোধন খুব ভালোবাসে। ভাষার তাতে প্রাণ থাক না থাক কিছু যায় আসে না। সতেরো-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো শতকের যে-সব চিঠিপত্র দলিল পাওয়া গেছে, তাতে আরবিফারসি শব্দের বাদশাহি চোখে পড়ে। এখন অনেকেই ওই বাঙলা ভাষার অর্থ বুঝে উঠতে পারবে না। একটি দলিলের অংশ :

> ইহার মৌধ্যে পরগনা পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িবার আহাদে হুজুর থাকিয়া পরোয়ানা লইয়া আর আর পরগনাতে দেওড়া ও মুরুত তোড়িতে লাগীল। এ বার্ত্তা ষুনিয়া ঠাকুর রামজীবন মৌলিকের বাড়িতে বাহির বাড়িতে আসিয়া রহিলা রাম সর্ম্মা ও ভগীরথ সর্ম্মা ওগয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকী পহরা রাত্রিদিন আছিল তাহার পর ২৭ মহররম মাহে ২৮ জৈষ্ট ঠাকুর দেখিবার......

বেশ রুগ্ন বাঙলা। তবে দলিল, আবেদন, বিজ্ঞপ্তির বাঙলা এখনো বেশ রুগ্ন।

সতেরোশতক থেকে বৈষ্ণব সাধকেরা কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে-গদ্যে এক ধরনের শাস্ত্রীয় রচনা লেখা শুরু করেন। রচনাগুলোর নাম 'কড়চা'। ধারাবাহিক গদ্যের স্রোত নেই এগুলোতে। মনে হয় এইমাত্র ভাষা অর্জন করেছে এমন কোনো শিশু প্রশ্ন করছে, আর উত্তর পাচ্ছে তারই মতো আরেকজনের থেকে। একটি কড়চার অংশবিশেষ এমন :

> তুমি কি। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কীরূপ হইল। তত্ত্ব বস্তু হইতে। তত্ত্ব বস্তু কি? পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র। ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল এক যোগে ভাণ্ড হৈল।

বৈষ্ণবদের যে-সব শাস্ত্রীয় রচনা পাওয়া গেছে সতেরো-আঠারো শতকের তাতে যে-গদ্য পাই, আর তাতে প্রকাশ করা হয়েছে যে-ভাব, তা খুবই তুচ্ছ। মনে হয় বাঙালি তখনো বলার মতো বক্তব্যই খুঁজে পায় নি। তাই ভাষা পাবে কোথা থেকে? জটিল কাহিনী বলার বেদনা তখনো জাগে নি তার মনে, বিশ্বজ্ঞানের কোনো এলাকাই ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে ওঠে নি তার। তাই স্রোতের মতো তার বুক থেকে উৎসারিত হয় নি গদ্যভাষা। তবে আঠারোশতকে রচিত দু-একটি রচনা পাওয়া গেছে যাতে খুঁড়িয়ে-জিরিয়ে-থেমে চলা গদ্য এগিয়েছে স্বাভাবিকভাবে। যেমন পাওয়া যায় আঠারোশতকের 'মহারাজ বিক্রমাদীত্যচরিত্র' নামের কাহিনীটিতে :

> মোং ভোজপুর শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম শ্রীমতি মৌনাবতি সোড়য বরিস্যা বড় ষুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙ্গ চক্ষু আর্কন্ন পর্যন্ত যুঙ্গ্য ভ্রর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ন্ন হস্ত পদ্মের মৃণাল স্তন দাড়িম্ব ফল রুপলাবন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যুৎছটা তাহার তুলনা আর নাঞী এমন ষুন্দরি সে কন্যার বিভাহ হয় নাঞী কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব।

আজকের ব্যাকরণ অনুসারে এটিতে ভুলের মেলা ব'সে গেছে। কিন্তু বোঝা যায় কথক বলার মতো একটি গল্প পেয়ে গেছেন, আর তিনি তা চমৎকারভাবেই বলবেন। কন্যাটিকে বড়োই দেখতে ইচ্ছে করে, ইচ্ছে হয় তাকে রাত পোহানোর আগেই কথা কহাই!

আসে অবিস্মরণীয় অব্দ ১৭৪৩। এ-বছরই প্রথম, সুদূর লিসবন শহরে, বাঙলা ভাষা মুদ্রাযন্ত্রস্থ হয়। মুদ্রিত হয় বাঙলা ভাষা। তবে বাঙলা বর্ণমালায় নয়, রোমান বর্ণমালায়। মুদ্রিত হয় তিনটি বই। একটির নাম *ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক-সংবাদ।* অন্য দুটির নাম *কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ* ও *ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পোরতুগিজ*। প্রথমটির লেখক বাঙালি। কিন্তু তিনি খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ ক'রে হয়ে গিয়েছিলেন খ্রিস্টান। তখন নাম হয়েছিলো তাঁর দোম আন্তোনিয়ো। অন্য দুটির প্রণেতা-সংকলকের নাম মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ। প্রথম বই দুটিতে পাওয়া যায় বাঙলা গদ্যের নমুনা। তৃতীয়টি একটি শব্দকোষ ও ব্যাকরণপুস্তক। দোম আন্তোনিয়ো বাঙালি ছিলেন। খ্রিস্টান হয়ে তিনি যখন জেসাসের ধর্মের উৎকর্ষ প্রমাণে উদ্যোগী হলেন, তখন তাঁর বাঙলা ভাষার ওপর নিশ্চয়ই প্রভাব ছড়িয়েছিলো লাতিন বাক্যের গঠন। খ্রিস্টধর্মের মূল কথা আয়ত্ত করার জন্যে কিছুটা লাতিন তিনি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর বইটি লিখেছিলেন সতেরোশতকের শেষ দিকে। সাধু গদ্যের অনেক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল তাঁর রচনায়। তাঁর রচিত কথোপকথন এমন :

ব্রাহ্মণ।-তুমি কারে ভজো।
রোমা।-পরমেশরেরে পুর্ণো ব্রমেরে।
ব্রাহ্মণ।-তবে তোমোরা বরো উতম ভজোনা ভজো, আমোরা তাহারে ভজি।
রোমা।-যদি তোমোরা সেই পূর্ণ ব্রমেরে ভজো তবে কেন এত কুরিত (কুরীত) কুধরাণ নানা অধর্ম্মো ভজানো দেখি।

রোমান অক্ষরে লেখা বাঙলা ভাষাকে বাঙলা বর্ণমালায় ঢাললে কিছুটা হারিয়ে যায়ই। অনেক শব্দের উচ্চারণ রোমান অক্ষরে হয়তো প্রকাশ করতে পারেন নি আন্তোনিয়ো; আবার তাঁর রোমান বর্ণে খচিত বাঙলাকে বাঙলা বর্ণমালায় প্রকাশ করতে গিয়ে কিছুটা হয়তো পিছলে গেছেন আধুনিক গবেষকরা। দোম আন্তোনিয়ো রামায়ণকাহিনী বলেছেন এমন গদ্যে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রামের এক স্ত্রী তাহার নাম সীতা, আর দুই পুত্ত্রো লব আর কুশ তাহান ভাই লকোণ, রাজা অযোধ্যা বাপের সত্যো পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধরিয়া লিয়াছিলেন, তাহার নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা আনিতে বিস্তর যুর্দো করিলেন, বালিরে মারি তাহার স্ত্রী তারা সুসীরেরে দিলেন, সে বালির ভাই, তাহারে রাজ খণ্ডো দিলেন; বিস্তর রাখ্যেস বধ করিলেন; কুর্মোকর্ণো বধিলেন, ইন্দ্রোজিৎ বধিলেন, প্রছাতে রাবোণ বধিয়া সীতারে আনিলেন।

এ-ভাষা দেখে মনে হয় গল্প বলতে গেলে গদ্য বেশ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কিন্তু চিন্তা প্রকাশ করতে গেলেই বিপদ বাঁধে। হোঁচট খেতে থাকে ভাষী ও বাঙলা ভাষা।

১৭৪৩-এ বাঙলা গদ্য চ'লে যায় ইউরোপিদের হাতে : ধর্মযাজক তাকে দীক্ষা দেন, ব্যাকরণপ্রণেতা অভিধানসংকলক তাকে শাসন করেন, আইনপ্রণেতা তাকে বিধিসম্মত করতে চান। বাঙলা ভাষার মানরূপ তখনো স্থির হয় নি, তাই বিদেশিদের পক্ষে বাঙলা আয়ত্ত ও প্রয়োগ করা খুব সহজ ব্যাপার ছিলো না। তাঁদের শিখতে হয়েছে আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা, লিখতে হয়েছে গ্রন্থের বাঙলা ভাষা। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা তাঁদের প্রকাশ করতে হয়েছে বক্তব্য। বাঙলা ভাষা প্রথম বক্তব্য প্রকাশ করতে শেখে ইউরোপিদের হাতে। বিদেশিদের বাঙলা গদ্যেই প্রথম প্রকাশ পায় বক্তব্য। তাঁদের গদ্যে ভুল আছে নানা রকম, আছে বিদেশি ঢঙের হোঁচট খাওয়ার ঘটনা, রয়েছে শব্দের অপপ্রয়োগ; তবে তাঁরাই সূচনা করেন ধারাবাহিক গদ্যের ধারা। তাঁদের বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব, আইন, এবং আরো অনেক কিছু।

বাঙলা ভাষায় প্রথম বিদেশি গদ্যলেখক পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তাঁর বইয়ের নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"। আসসুম্পসাঁউও কাহিনী বলার সময় বেশ স্বাভাবিক; কিন্তু যেই কথা বলতে শুরু করেছেন বা রচনা করেছেন প্রার্থনাসঙ্গীত, অমনি তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে বিদেশির বাঙলা। তাঁর কাহিনীর গদ্য এমন :

হিস্পানিয়া দেশে মাদ্রিদ শুহরে দুই গলিম পুরুষ আছিল: বিস্তর দিন তাহারা একজনে আর জনেরে তালাশ করিয়াছিল দাদ তুলিবার কারণ। কষ্টের দিন ছয় ঘড়ি দুই পহর বাদে তাহারা জনে জনেরে লাগাল পাইল, লাগাল পাইয়া দুইজনে ও তরোয়াল খসিয়া মারামারি করিল। যে জনে বেশ তেজবন্ত সে আরো এক চোট দিল, সে মাটিতে পড়িল, পরাজয় হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ হয় আসসুম্পসাঁউর এ-বাঙলার ওপর প্রভাব ফেলেছে তাঁর মাতৃভাষা পর্তুগিজ। ঢাকার আঞ্চলিক বাঙলা এখানে আছে প্রকাশ্যে, গোপনে হয়তো আছে পর্তুগিজ বাক্যের গঠন।

পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ যখন বাঙলা গদ্য লেখেন ও প্রকাশ করেন দোম আন্তোনিয়োর লেখা বই, তখন তিনি জানতেন না যে আন্তোনিয়ো ছাড়া কোনো বাঙালি তাঁরও আগে লিখেছিলেন বাঙলা গদ্য।

আসসুম্পসাঁউর সাড়ে তিন দশক পর যখন ইংরেজরা বাঙলা ভাষায় উৎসাহী হন, উদ্যোগী হন বাঙলা ভাষা শিখতে ও শেখাতে, এবং রচনা করেন বাঙলা গদ্য, তখন তাঁরা জানতেন না যে তাঁদের আগে আদৌ কেউ লিখেছিলেন বাঙলা গদ্য। তাঁদের সামনে ছিলো একটি সত্য;—বাঙলা সাহিত্য গদ্যহীন। এটা সত্য ছিলো তাঁদের জন্যে, কেননা বাঙলা গদ্য রচনার সময় কোনো নমুনাই উপস্থিত ছিলো না তাঁদের সামনে। তাই তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছিলো শুরু ও শূন্যতা থেকে। কিন্তু তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে বাঙলা ভাষাকে ভ'রে দেন বিভিন্ন রকম গদ্যে, এবং সৃষ্টি করেন বাঙলা গদ্যের অবিরাম ধারা। তাঁদের নিজেদের লেখা হয়তো অসাধারণ ছিলো না, ছিলো তাতে বহু ভুলভ্রান্তি। তাঁদের লেখা বহু বাক্য হাস্যকর। কিন্তু বাঙলা গদ্যের অবিরাম ধারা সৃষ্টিতে ইংরেজের দানকে অস্বীকার করা যায় না। এক সময় বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বাঙলা গদ্য সৃষ্টির প্রায় সমস্ত কৃতিত্ব দিতেন তাঁদের; এখন চলছে তাঁদের কৃতিত্ব অস্বীকারের সময়। বাঙালি সম্ভবত কখনো সত্যের মুখোমুখি হবে না।

AMARBOI.COM

আঠারোশতকে ইংরেজরা ব্যাকরণ-অভিধান প্রণয়ন করেছেন, ও বাঙলা গদ্যে অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন আইন। ওই বাঙলায় অনূদিত আইনগুলোতেই প্রথম বাঙলা ভাষায় প্রকাশ পায় জটিল বক্তব্য, ও রচিত হয় মিশ্রজটিল বাক্য। এ-গ্রন্থগুলোর গদ্যের সাথে পুরোনো বাঙলা গদ্যের দুস্তর পার্থক্য। মনে হয় এই প্রথম পরিবেশিত হলো বাঙলা গদ্যে উল্লেখযোগ্য চিন্তা-বক্তব্য। এ-গ্রন্থগুলোতেই বপন করা হয় আধুনিক বাঙলা গদ্যের বীজ। আইনের বাঙলা অনুবাদগ্রন্থগুলোর মধ্যে আছে জোনাথন ডানকানের দেওয়ানি আইনসংক্রান্ত ইম্পেকোডের বাঙলা অনুবাদ (১৭৮৫), বেনজামিন অ্যাডমনস্টোনের ফৌজদারি আইনসংক্রান্ত গ্রন্থ (১৭৯৩), ও হেনরি পিটস ফরস্টারের *কর্নওয়ালিশ কোড* (১৭৯৩)। ডানকানের গদ্য এমন :

> সদর দেওয়ানি আদালতে যদি কোন সাক্ষী আজ্ঞা মতো সাক্ষাৎ না আইসে অথবা সাক্ষাৎ আসিয়া সুকৃতি না করে কিম্বা সাক্ষি পত্র লিখিয়া তাহাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> স্বাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা আপন অভিপ্রায় মতে অথবা কিছু গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষি দেয় কিম্বা কচহরির মধ্যে আদালতের অসম্মান করে তবে তাহার সমুচিত জন্যে পূর্ব্বে মপস্বল আদালতের ব্যবস্থাপক সাহেবের দিগের যে মত অধিকার লেখা গিয়াছে সদর দেওয়ানি আদালত হইতে ও সেই মত সমুচিত হবেক—

এখনকার মানদণ্ডে কিছুকিছু ত্রুটি থাকলেও এ-গদ্যকে চমৎকার না ব'লে উপায় নেই। আজকের বহু বাঙালির পক্ষেও ওপরের পংক্তিগুচ্ছ রচনা করা কঠিন।

খুব ভালো হয়েছিলো যে ইংরেজ ধর্ম নিয়ে বাঙলা গদ্যচর্চায় নামে নি। কিন্তু অল্প পরেই মহাসমোরোহে ধর্ম এসে উপস্থিত হয়। বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদের মুদ্রণে মুখর হয়ে ওঠে মুদ্রাযন্ত্র। বাইবেলে বাইবেলে হিব্রু-লাতিনের অনুকরণে রচিত হয় একরকম অদ্ভুত স্বাদযুক্ত বাইবেলি বাঙলা গদ্য, যার কিছু অংশ হাস্যকর, কিছু অংশ অভাবিত, আর কিছু অংশ মহান। বাঙলা বাক্যের পদক্রম নানাভাবে এলোমেলো হয়ে যায় বাইবেলের মূল ভাব আর বাক্যের গঠন শুদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টায়। ধর্মগ্রন্থ সব সময়ই বাঙলায় অনূদিত হয়েছে বেশ বিশ্রী ভাষায়—সম্ভবত অনুবাদকেরা ঈশ্বরের ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠেছেন বারবার আর পীড়ন নির্যাতন চালিয়েছেন নিরীহ বাঙলা ভাষার ওপর। এমন একটি অনুবাদ হচ্ছে *মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত* (১৮০০)। এটির অনুবাদক টমাস ও রামরাম বসু; সংশোধক উইলিয়াম কেরি। এতেই সূচিত হয় বাইবেলি বাঙলা গদ্য :

> সে দিনে য়েশু ঘর হইতে যাইয়া বসিলেন সমুদ্রের তিরে। এবং হেন বড় মানব্য একত্তর হইল তাহার স্থানে তাহাতে জাহাজে যাইয়া বসিলেন ও সকল মানব্য তটের উপরে ডাণ্ডাইল। এবং তিনি হিত উপদেশ কহিলেন অনেক বিষয় তাহারদিগের বলিয়া দেখ এক বীজ বুনক বীজ বুনিতে গিয়াছে। বুনিতে ২ কিছু পড়িল পন্থের পার্শ্বে ও পক্ষেরা আসিয়া তাহ গ্রাস করিল।

এতে বিলেতি বাঙলা গদ্যের কিছু লক্ষণ সহজেই চোখে পড়ে।

কেউকেউ বাঙলা না শিখেই অন্যদের বাঙলা শেখাতে চেয়ে পরিণত হয়েছেন উপহাস্যকর উদাহরণে। জন মিলার *সিক্ষ্যাগুরু* প্রকাশ করেছিলেন ১৭৯৭ অব্দে, যখন তিনি নিজেই ঠিক মতো আয়ত্ত ক'রে উঠতে পারেন নি বাঙলা ভাষা। 'সিখাইতে তোমারদিগেরকে ইঙ্গরাজি কথা সহজে আর অনাআসে', বা 'অতয়েব আমি বিবেচনা করিয়া এ তরজমা করিয়াছি চলতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথার দ্বারায়' ধরনের বিলেতি বাঙলা লিখে বিখ্যাত হয়ে আছেন মিলার। তবে তাঁদের সবার বাঙলা গদ্য এমন নয়। অবশ্য বিলেতি বৈশিষ্ট্য তাঁরা বাঙলায় খচিত করেছেন নানাভাবে। 'আমরাও দেখিলাম না তাহারে' বা 'বির্ধকালে পুণ্যে পুর্ণিৎ মরিয়া চলিয়া গেল স্বর্গে', বা 'আত্মা স্বর্গে গেল উড়িয়া', বা 'সে এক পুত্র জর্মাইল' ধরনের বিদেশি বাঙলা জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে মাঝেমাঝেই।

১৮০১ সালে শুরু হয় আধুনিক বাঙালির বাঙলা গদ্যের ধারা। এ-বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বেরোয় রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্যচরিত্র"। দেড় দশক ধ'রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙালি পণ্ডিতেরা সংস্কৃত থেকে আঞ্চলিক শব্দে অবিরাম যাতায়াত ক'রে নানাভাবে বাড়িয়ে দেন বাঙলা গদ্যের শক্তি। রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতের পরে আসেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়ের মতো তার্কিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ। বিকশিত হ'তে থাকে বাঙলা গদ্য; স্থির হ'তে থাকে তার সর্ববঙ্গীয় রূপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় বাঙলা গদ্য লাভ করে সুস্থিতি। তারপর বিভিন্নভাবে বিকশিত হয় বাঙলা গদ্য, সরল, জটিল বিজ্ঞানমনস্ক কাব্যিক ও আরো বিভিন্ন রূপের গদ্যে ভ'রে ওঠে বাঙলা ভাষা। উনিশশতকের মাঝামাঝিই স্থির হয়ে যায় বাঙলা ভাষার একটি রূপ, যাকে বলা হয় সাধুভাষা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান বাঙলা ভাষা : সাধু ও চলতি

পৃথিবীতে বহু ভাষা আছে। তবে সব ভাষা সমান উন্নত নয়; সব ভাষার শক্তি সমান নয়। ভাষার মূল কাজ সমাজের মানুষের যোগাযোগে সাহায্য করা। সব ভাষাই এ-কাজটি চমৎকারভাবে করে। ধরা যাক একটি আঞ্চলিক ভাষার কথা। ভাষাটি ব্যবহৃত হয় দেশের একটি ছোটো এলাকায়। ওই এলাকার মানুষেরা ভাষাটি ব্যবহার ক'রে স্বচ্ছন্দে জীবন চালায়। কিন্তু ভাষাটি তার চেয়ে বেশি কিছু পারে না। তাতে কোনো কবিতা লেখা হয় না, রচিত হয় না উপন্যাস। তাতে জ্ঞানের কোনো কথাই লিখিত হয় না। ওই ভাষার শব্দের সংখ্যা খুব কম। তাতে আধুনিক জীবনের জন্যে দরকারি সব কাজ সম্পন্ন করা যায় না। তাই ওই ভাষাটি অনুন্নত, অবিকশিত। ভাষাটির বিকাশ ঘটানো যেতো, সাধন করা যেতো উন্নতি; কিন্তু নানা কারণে তা হয় নি।

কিন্তু পৃথিবীর বেশ কিছু ভাষার ঘটেছে বিপুল উন্নতি। সেগুলোর সাহায্যে সামাজিক যোগাযোগ খুব চমৎকার সম্পন্ন তো হয়ই; তার ওপরও সম্পন্ন হয় আরো বহু কাজ। এমন ভাষাকে বলা হয় 'উন্নত' বা 'বিকশিত' বা 'মানসম্পন্ন' ভাষা। আদিযুগে বা মধ্যযুগে বাঙলা ভাষা ছিলো একটি অবিকশিত বা অনুন্নত ভাষা। একটি ভাষা বলাও ঠিক নয়। বাঙলা ভাষা বলতে ছিলো একগুচ্ছ আঞ্চলিক ভাষা—দেশের একএক অঞ্চলে ছিলো তার একএক রূপ। সে-রূপগুলোর মধ্যে অবশ্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। ওই আঞ্চলিক ভাষাগুচ্ছে বা বাঙলা ভাষায় আদি ও মধ্য যুগে লেখা হয়েছে কিছু কবিতা ও কাব্য। তার বেশি কিছু হয় নি। তাই ওই সময়ে বাঙলা ভাষার বিকাশ ঘটেছে বেশ কম। জ্ঞানের কোনো শাখার প্রকাশ-মাধ্যমরূপেই ব্যবহৃত হয় নি বাঙলা ভাষা। তার ছিলো না এমন কোনো রূপ, যা ব্যবহৃত হতো সারা বাঙলা ভাষাঞ্চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো একটি ভাষার বিকাশ ঘটার জন্যে দরকার পড়ে ওই ভাষা যারা বলে, তাদের জাতীয় চেতনা। একটি জাতি যখন বোধ করে যে এ-ভাষাটি তাদের, তখন তারা বিকাশ ঘটাতে থাকে তাদের ভাষার। আর ওই জাতির যদি থাকে একটি নিজস্ব রাষ্ট্র, তাহলে তো ভাষার বিকাশ ঘটে খুব দ্রুত। কেননা রাষ্ট্রের জন্যে দরকার হয় এমন একটি ভাষা, যা দিয়ে পালন করা যায় রাষ্ট্রের দরকারি সব কাজ। মধ্য যুগে বাঙালির জাতীয় চেতনা আজকের মতো ছিলো না। কিন্তু তা দেখা দেয় ক্রমশ, এবং উনিশশতকে ওই চেতনা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। বাঙলা ভাষারও বিকাশ ঘটতে থাকে। কোনো জাতি যখন একটি ভাষাকে আপন ভাষা ব'লে গ্রহণ করে, সম্পন্ন করতে চায় ওই ভাষার সাহায্যে সব ভাষিক কাজ, তখন দরকার পড়ে ভাষাটির একটি 'মানরূপ'। মানরূপ, অর্থাৎ ভাষাটির এমন রূপ, যা সারা দেশে অভিন্ন। তা আঞ্চলিক নয়। তা সমগ্র দেশিক। আদিযুগে ও মধ্যযুগে বাঙলা ভাষার কোনো মানরূপ ছিলো না। তার এমন কোনো রূপ ছিলো না, যা ব্যবহৃত হতো বাঙলা ভাষাঞ্চলের সমগ্র এলাকায়। মানরূপ ছিলো না, কেননা আদি ও মধ্য যুগের বাঙালির দরকার হয় নি মানরূপের।

কোনো ভাষার মানরূপ সৃষ্টি করতে হ'লে দুটি দিকে মনোযোগ দিতে হয়। প্রথমে ভালোভাবে স্থির করতে হয় ভাষাটির অবয়ব বা শরীর। অর্থাৎ ভাষাটিতে কতোগুলো ধ্বনি আছে, তার প্রতিটি শব্দের রূপ আর বানান কী, প্রতিটি শব্দের অর্থ কী ইত্যাদি বিষয় স্থির ক'রে ফেলতে হয়। কেউ বলবে বা লিখবে 'খাইছি', কেউ 'খেয়েছি', তা চলবে না। সবকিছু হবে সুস্থিত। সুস্থির। অবশ্য চরমভাবে কোনো কোনো ভাষাই সুস্থির নয়। ভাষার রূপ স্থির হয়ে গেলে দেখতে হয় ভাষাটি কতোটা দায়িত্ব পালন করতে পারে। কোনো ভাষায় যদি শুধু আলাপই করা যায়, আর কিছু করা না যায়, তবে সেটা বিশেষ কাজের ভাষা নয়। ভাষা দিয়ে কবিতা লিখতে হবে, রচনা করতে হবে উপন্যাস। জ্ঞানের সমস্ত কিছু প্রকাশের উপযোগী হ'তে হবে ভাষাটিকে। তাকে দিয়ে ব্যবসা চালাতে হবে, রাজনীতি করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রয়োজন মেটাতে হবে ভাষাটিকে। যদি তা পারে, তখন বলবো যে ভাষাটি পালন করতে পারে বিভিন্ন ভূমিকা। কোনো ভাষার রূপ স্থির আর ভূমিকা বিশদ হ'লেই ভাষাটিকে ধরা হয় 'উন্নত', বা 'বিকশিত', বা 'মানবদ্ধ', বা 'মানসম্পন্ন', বা 'মানভাষা' ব'লে।

"চর্যাপদ"-এর কালে বাঙলা ভাষা ছিলো খুবই অবিকশিত। তার শব্দের রূপ স্থির হয় নি, ধ্বনিও অস্থির। জ্ঞানের কথা তখনো শোনে নি বাঙলা ভাষা। মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে বিকশিত হয় বাঙলা ভাষা। সাহিত্য সৃষ্টি হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষায় বিপুল পরিমাণে। ধনাঢ্য হয়ে ওঠে বাঙলা শব্দভাণ্ডার। কিন্তু বাঙলা ভাষার রূপ তখনো অস্থিত। আঞ্চলিকতার ছোঁয়া তাতে বড়ো বেশি। তখনো সারা দেশের আঞ্চলিক ভাষারাশি ছেঁকে সৃষ্টি করা হয় নি কোনো সর্ববঙ্গীয় বাঙলা ভাষা। মানভাষা। কিন্তু মানভাষা সৃষ্টির অসচেতন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তখন। সাধুভাষায় যে 'করিল', 'করিতেছিল', 'হইল', 'হইবে' প্রভৃতি ক্রিয়ার রূপ বসে, মধ্যযুগেই সে-রূপগুলো তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ব্যবহৃত হ'তে শুরু করেছিলো ব্যাপকভাবে। দেখা দিয়েছিলো 'তাহার', 'উহার', 'ইহার' ইত্যাদি পরিপূর্ণ সর্বনামরূপ। কিন্তু আঠারো-শতকের শেষভাগ থেকে শুরু ক'রে উনিশশতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরে সৃষ্টি করা হয় বাঙলা ভাষার একটা মানরূপ। তার নাম সাধুভাষা বা সাধু বাঙলা ভাষা বা সাধুরীতি।

বাঙলা ভাষার একটি মানরূপের সন্ধান চলছিলো অনেক বছর। উনিশশতকে সেটি দেখা দেয় সাধুভাষার রূপ ধ'রে। কোনো ভাষার মানরূপের ভিত্তি হয়ে থাকে এমন একটি উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা, যা প্রভাবশালী। হয়তো ওই উপভাষাটিতে অনেক দিন ধ'রে সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাই তার বিকাশ ঘটেছে অন্যান্য উপভাষার চেয়ে ভালোভাবে। এমনও হ'তে পারে যে ভাষার মানরূপ সৃষ্টির সময় ওই উপভাষী ব্যক্তিরা পালন করেন বিশেষ ভূমিকা। অনেকের মতে বাঙলা সাধুভাষার ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে নদিয়া-শান্তিপুর ও ভাগীরথীর উভয় কূলে প্রচলিত উপভাষাটি। কিন্তু সাধুভাষার সৃষ্টিকারীরা ওই উপভাষাটিকে ভিত্তি ক'রে গড়ে তুলেছিলেন এমন একটি মার্জিত বাঙলা ভাষারূপ, যা বিশেষ কোনো অঞ্চলের নয়। তাঁরা সংস্কৃত থেকে শব্দ ঋণ করেছেন অবিরলভাবে, তৈরি করেছেন নতুন শব্দ, বিকাশ ঘটিয়েছেন বিভিন্ন রকম বাঙলা বাক্যের। ফলে জন্ম নিয়েছে বাঙলা ভাষার একটি মানরূপ। কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং আরো অনেকের শ্রমে ক্রমবিকশিত হয় সাধুভাষা। তবে তাঁদের ভাষায় ছিলো কোনো-না-কোনো রকম অস্থিতি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায়, *সীতার বনবাস*-এ, সাধুরীতি লাভ করে স্থির মানরূপ। এর পর বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে সাধুরীতির বাঙলায় নিয়ে আসেন নানা বৈচিত্র্য। কিন্তু তার মূলকাঠামো বদলায় নি।

তাই উনিশশতকের মাঝামাঝি বাঙলা ভাষার মানরূপ সাধুভাষাই হয়ে ওঠে বাঙলা ভাষা। ওই ভাষা ছিলো সর্ববঙ্গীয়; বাঙলার সব অঞ্চলেই সাধুভাষার রূপ ছিলো অবিভিন্ন। কিন্তু সাধুভাষা ছিলো একটি বড়ো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমাবদ্ধতা বা সমস্যা। সাধুভাষা লেখার ভাষা। বহু বই লেখা হয়েছে সাধুভাষায় বা সাধুরীতিতে; কিন্তু ওই ভাষায় কেউ কখনো, শুধু পাগল আর যাত্রাভিনেতারা ছাড়া, কথা বলে নি। তাই বাঙলার একটি মানভাষা জন্ম নেয়, লেখার কাজে খুব দক্ষতার পরিচয় দেয়, কিন্তু ব্যর্থ হয় একটি এলাকায়। সেটি হচ্ছে কথা বলার এলাকা। মানভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে সম্পন্ন করা সম্ভব সব কিছু। তা হবে মুখের ভাষা, তা হবে লেখার ভাষা। যদি তা না হয়, তাহলেই সমস্যা দেখা দেয়। এক রীতির ভাষায় বই লিখবো, আর অন্য রীতির ভাষায় কথা বলবো, এটা এক ঝামেলা। বাঙলা সাধুভাষা আমাদের প্রতিদিনের জীবন ও তাপ থেকে চ'লে গিয়েছিলো অনেক দূরে। আবার যে-ভাষা ছিলো জীবনের, যাতে কথা বলা হতো, তাতে কিছু লেখা চলতো না। তাই একটি সমস্যা দেখা দেয়। এ-সমস্যার সমাধানরূপে জন্ম নেয় আরেকটি মান বাঙলা ভাষা। তার নাম চলতি ভাষা বা চলতি রীতি বা চলতি বাঙলা।

চলতি বাঙলার জন্মস্থানের নাম কলকাতা। উনিশশতকের বাঙলাদেশ ও ভাষার কেন্দ্র কলকাতা। মধ্যযুগে এক অঞ্চলের বাঙালি খুব কাছাকাছি আসে নি আরেক অঞ্চলের বাঙালির। তাই তাদের দরকার হয় নি এমন একটি কথ্য বাঙলা, যাতে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সব এলাকার বাঙালি। উনিশশতকে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালি শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসায় ও আরো সহস্র কারণে উপস্থিত হয় কল্লোলিনী কলকাতায়। তাদের দরকার হয় একটি কথ্য ভাষারীতি, যা সকলের। সাধুভাষা দিয়ে ওই কাজ সম্ভব ছিলো না। কেননা তা বোবা। তাদের দরকার হয় একটি মুখর ভাষা, যার নাম চলতি ভাষা। এক সময় বলা হতো চলিত ভাষা। রবীন্দ্রনাথ একে বলতেন প্রাকৃত বাঙলা।

চলতি বাঙলার জন্ম কলকাতায় হ'লেও তা কলকাতা শহরের উপভাষাভিত্তিক ছিলো না। যে-অঞ্চলের উপভাষা ভিত্তি ক'রে জন্ম হয়েছিলো সাধুভাষার, সে-অঞ্চলের উপভাষা ভিত্তি ক'রেই জন্ম নেয় চলতি ভাষা। নদিয়া, শান্তিপুর, ভাগীরথীর দু-কূলের ভাষা কলকাতা শহরে এসে আধুনিক বাঙালির প্রয়োজন মেটাতে হয়ে ওঠে চলতি ভাষা। চলতি ভাষা কথ্য ভাষা, মুখের ভাষা। তাতে শুধু কথা বলা হতো এক সময়। উনিশশতকের মাঝামাঝি বাঙলা ভাষার দেখা দেয় দুটি মানরূপ। একটি সাধুভাষা : লেখার ভাষা। অন্যটি চলতি ভাষা : কথার ভাষা। সাধু ও চলতি ভাষা দুই তপস্বী ছিলো না যে এক ছায়ার নিচে শান্তিতে ধ্যান করবে। তারা হয়ে ওঠে এক বাঙলা-রাজ্যে দুই রাজা। রাজাদের কাজ যুদ্ধ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশতকের মাঝামাঝি বাঙলা ভাষার দুই রাজার, সাধু ও চলতির, যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যুদ্ধের উত্তেজনা টিকে থাকে শতাব্দীব্যাপী। আজো তা পুরোপুরি থেমে যায় নি।

উনিশশতকের মাঝামাঝি সাধুরীতিটি তার রাজত্ব পেতে বসে মহাসমারোহে। তখন তার রূপ বেশ দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে গেছে। ভারিভারি শব্দে আর লম্বা লম্বা ক্রিয়ারূপে, উৎকলিকাকুল, অবয়বসংস্থানাদিকৃত, গমন করিলেন, হরণ করিয়াছে, প্রযুক্ত, পুরঃসর প্রভৃতিতে, চমৎকারভাবে সেজেগুজে, বলা যাক সজ্জিত হয়ে, লাভ করেছে অনমনীয় রাজকীয় মহিমা। অর্থাৎ উনিশশতকের মধ্যভাগের সম্রাট সাধুরীতি। কিন্তু মুখেমুখে তখন জন্ম নিচ্ছিলো বিদ্রোহী চলতি রীতি। ওই সময়ে চলতি রীতিটি খুব স্থির রূপ পায় নি, কিন্তু রূপ পেয়েছে অনেকখানি। কিছুটা শক্তি আয় ক'রেই বিদ্রোহী চলতি রীতি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে বসে সাধুরীতির বিরুদ্ধে, উনিশশতকের মাঝামাঝি। ওই বিদ্রোহের ইশতেহার প্রথম ঘোষিত হয়, দ্রোহের পতাকা প্রথম ওড়ানো হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের এক অভূতপূর্ব গদ্যসৃষ্টি "আলালের ঘরে দুলাল"-এ। ১৮৫৮-তে। তখন চলতি রীতির জয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। কেননা তখনো সে শক্তি অর্জন করে নি, তার রূপ স্থির হয় নি। তবে তা নাড়া দেয় সাধুরীতির শেকড়সুদ্ধ। সাধুরীতি ক্রমেক্রমে আসতে থাকে চলতির কাছাকাছি, বড়োবড়ো শব্দ বিদায় নিতে থাকে সাধুরীতি থেকে। কিন্তু শরীরে বা রূপে সাধুরীতিই থেকে যায়। তার ক্রিয়ামাত্রই 'করিয়াছিলেন', 'হইতেছিল', সর্বনামমাত্রই 'তাহার', 'তাহাকে', 'তাহাদিগকে', 'আমাদিগের'।

উনিশশতক ধ'রে মুখেমুখে, ও কিছুটা লেখায়, শক্তি, সৌষ্ঠব, মান আয়ত্ত করতে থাকে চলতি রীতিটি। এ-রীতিটির ছিলো একটি স্বাভাবিক সুবিধা। চলতি ভাষা মুখের ভাষা, চলতি ভাষা লেখার ভাষা। এটা নির্বাক নয়, এটা নিরক্ষর নয়। কথাও বলতে জানে, লিখতেও জানে। তাই তো তার মধ্যে লুকিয়ে ছিলো জয়ের বীজ। বিদ্রোহীরা কখনো পরাজিত হয় না। বিদ্রোহী চলতি রীতির জন্যেও অপেক্ষা ক'রে ছিলো অবধারিত জয়। বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে, ১৯১৪ অব্দে, প্রমথ চৌধুরী দেখা দেন চলতি রীতির প্রবক্তারূপে। তিনি দাবি করেন যে বিদায় জানাতে হবে সাধুরীতিকে, প্রতিষ্ঠিত করতে হবে চলতি রীতিকে, কথা ও লেখায়, সব এলাকায়। তাঁর বিদ্রোহ আলোড়ন আনে বাঙলা ভাষারাজ্যে। এগিয়ে আসেন বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সন্তান ও পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি চলতি রীতিতে লিখেছিলেন এর আগেও। কিন্তু বেশি লেখেন নি। উনিশশো চোদ্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ চলতি রীতিকেই মেনে নেন বাঙলা ভাষারূপে। চলতি রীতি হয়ে ওঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানভাষা, বাঙলা ভাষা। এগিয়ে আসেন অন্যরা। ধীরেধীরে বিদায় নিতে থাকে সাধুরীতি।

এখন তো সাধুরীতি যাপন করছে মরণোত্তর জীবন। রবীন্দ্রনাথ সাধু-চলতির কলহকে ব্যাখ্যা করেছিলেন রূপকথার রূপকে। বাঙলা রূপকথায় এক রাজার দুই রানী, সুয়ো ও দুয়োরানীর ঝগড়া, খুব বিখ্যাত। রূপকথার শুরুতে সুয়োরানী রাজার প্রিয়তমা, তখন পীড়নে দুঃখে দিন কাটে দুয়োরানীর। রূপকথার শেষে দুয়োরানী হয়ে ওঠে প্রিয়তমা, বিদায় নেয় সুয়োরানী। রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন সুয়োরানী বিদায় নেবে, সিংহাসনে বসবে দুয়োরানী। তাঁর বাণী ফলে গেছে। বাঙলা ভাষার দুয়োরানী, চলতি রীতি, এখন সিংহাসনে। সাধুরীতি ঘুমিয়ে আছে রবীন্দ্রকথিত 'ঐতিহাসিক কবরস্থানে'। তবে তার কবরস্থান অবহেলায় মলিন নয়। তা এখন তীর্থের মতো। এখন চলতি বাঙলাই মান বাঙলা ভাষা। বাঙলা ভাষা।

কোথায় বিরোধ সাধু আর চলতির? এক সময় মনে করা হতো যে তাদের বিরোধটা খুব বড়ো। সাধুরীতি হবে গুরুগম্ভীর শব্দে পরিপূর্ণ, তাতে শোনা যাবে সংস্কৃত গর্জন, লম্বালম্বা ক্রিয়ারূপের নিনাদ। তা হবে মুখের ভাষা থেকে খুবই দূরের। আর চলতি রীতি হবে সরল সোজা মুখের ভাষা, যাতে থাকবে না জটিল কোনো ভাব। অর্থাৎ এদের মধ্যে থাকবে দুস্তর দূরত্ব। একটি জীবন থেকে দূরে থাকবে; প্রকাশ করা হবে তাতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। অন্যটি হবে জীবনের ভাষা; কিন্তু তাতে সহজ সরল সাধারণ কথা ছাড়া কিছু বলা যাবে না। এমন দেয়াল টেকার কথা নয়। যতোই দিন যেতে থাকে, চলতি বাঙলায় প্রকাশ পেতে থাকে জীবনের সমস্ত কিছু। তাতে যেমন বলা যায় 'কাছে এসো', তেমনি বলা যায় 'অসলংগ্ন ভাবচ্ছবির অনিকাম সংঘট্ট'। এখন সাধু-চলতির মধ্যে পার্থক্য সামান্য। আছে উচ্চারণে কিছুটা ভিন্নতা, আছে শব্দগত কিছুটা পার্থক্য, আছে বাক্যগঠনে প্রায়-ধরা-যায়-না এমন ভিন্নতা। সাধু-চলতির প্রধান পার্থক্য ক্রিয়ারূপে আর সর্বনামে। যাইব, খাইব, করিব, চলিব সাধু। যাবো, খাবো, করবো, চলবো চলতি। তাহাকে, তাহাদিগের, যাহা সাধু। তাকে, তাদের, যা চলতি। এখন সাধু-চলতির বড়ো ব্যবধান এখানেই। তবে সাধু আর নেই। চলতি রীতি শোষণ ক'রে নিয়েছে তার সব শক্তি। ক্রিয়ারূপ আর সর্বনামের রূপ ঠিক রেখে যাই বলা আর লেখা হোক, তাই চলতি ভাষা। সাধুরীতি আজ মৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিধানের ইতিকথা

অভিধান বা শব্দকোষ। খুব মোটা একটি বই, জায়গা জুড়ে থাকে অনেকখানি। বইটিতে কোনো গল্প থাকে না, ছড়া থাকে না। থাকে শব্দের পর শব্দ; বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজানো। প্রথমে থাকে 'অ' দিয়ে যে-সব শব্দ শুরু, সেগুলো; তারপর 'আ' দিয়ে যে-সব শব্দ শুরু, তারপর 'ই' দিয়ে শুরু। এভাবে বর্ণের ক্রম অনুসারে সাজানো থাকে শব্দ অভিধান। যে-গ্রন্থে শব্দের নাম, সংজ্ঞা বা উপাধি অর্থাৎ অভিধা, অর্থাৎ অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়, তার নাম অভিধান। অভিধানের অন্য নাম শব্দকোষ। অর্থাৎ শব্দের ভাণ্ডার। অভিধানে সংকলিত হয় ভাষার শব্দরাজি। সব শব্দ কি থাকে? থাকে না। তবে বিপুল পরিমাণ শব্দ সংকলিত থাকে অভিধানে। অভিধান ব্যবহার করি আমরা প্রধানত শব্দের অর্থ জানার জন্যে। তবে শব্দের বানান, উচ্চারণ, শব্দটি এসেছে কোথা থেকে ইত্যাদি জানার জন্যেও ব্যবহার করি অভিধান। কারো কারো মনে হয় শব্দের বানান ও অর্থ সম্পর্কে শেষকথা লেখা আছে অভিধানে। অভিধান জানিয়ে দেয় শব্দের শুদ্ধ রূপ কী, শুদ্ধ বানান কী, শুদ্ধ অর্থ কী। অভিধান মানেই হচ্ছে শুদ্ধতা আর শুদ্ধতা। পৃথিবীর সব গুরুত্বপূর্ণ ভাষারই অভিধান বা শব্দকোষ আছে। আছে বাঙলা ভাষারও।

আদি ও মধ্য যুগে সংকলিত হয় নি বাঙলা ভাষার কোনো অভিধান। দরকার পড়ে নি বাঙালির; দরকার পড়ে নি বাঙলার কবিদের। তখন বাঙলা ভাষার মানরূপ স্থির হয় নি, কোনো আগ্রহ-উৎসাহ দেখা দেয় নি মানরূপ স্থির করার। কোনো জাতি যখন তার ভাষার মানরূপ স্থির করতে উৎসাহী হয়, তখনি তার আগ্রহ জাগে অভিধান সংকলনের। ভাষার মানরূপ স্থির করার জন্যে প্রথমে দরকার হয় শব্দগুলোর রূপ ঠিক করা, তাদের বানান ঠিক করা, অর্থ ঠিক করা। এ-কাজ করা সম্ভব অভিধানের সাহায্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতালীয়রা, ফরাশিরা এ-কাজ করেছিলো একাডেমি প্রতিষ্ঠা ক'রে; আর ইংল্যান্ডে একজন ব্যক্তিই একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান সংকলন ক'রে অনেকখানি স্থির ক'রে দিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার মানরূপ।

আঠারোশতককেও বাঙলি কোনো প্রয়োজনবোধ করে নি আপন ভাষার মানরূপ স্থির করার। তাই অভিধানেরও কোনো প্রয়োজন বোধ. হয় নি বাঙালি জাতির। আঠারোশতকের তৃতীয় দশকে একজন বিদেশি—পর্তুগিজ—ধর্মযাজক ঢাকা জেলার ভাওয়ালে প্রচার করছিলেন জেসাসের ধর্ম। তিনি দরকার বোধ করেন একটি অভিধানের। বাঙলা তো তাঁর মাতৃভাষা ছিলো না যে তিনি মন থেকেই পাবেন এক একটি শব্দ ও বানান ও অর্থ। তিনি নিজের ও তাঁর শ্রেণীর ধর্মযাজকদের জন্যে সংকলন করেন একটি অভিধান। ওই ধর্মযাজকের নাম মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তাঁর অভিধানের নাম "ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পর্তুগিজ"। এটি একটি দ্বিভাষিক অভিধান। এটির প্রথম অংশে দেয়া হয়েছে বাঙলা শব্দের পর্তুগিজ প্রতিশব্দ; আর দ্বিতীয় অংশে দেয়া হয়েছে পর্তুগিজ শব্দের বাঙলা প্রতিশব্দ। পাদ্রি আসসুম্পসাঁউর অভিধান লিসবন শহরে প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে। এটিই বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধান। আসসুম্পসাঁউ বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধানপ্রণেতা। তাই অমর হয়ে আছেন এ-পাদ্রি বাঙলায়। তিনি শুধু অভিধান সংকলন করেন নি, অভিধানের সাথে জড়িয়ে দিয়েছিলেন একটি খণ্ডিত ব্যাকরণ। তাই আসসুম্পসাঁউ বাঙলা ভাষার প্রথম অভিধানপ্রণেতা, ও প্রথম ব্যাকরণরচয়িতা। পর্তুগালে তাঁর নাম মুছে গেছে; কোনো স্বর্গ নেই ব'লে সেখানেও বিরাজিত দেখা যাবে না দূর দেশের এ-পাদ্রিকে। কিন্তু বাঙলা ভাষা তাঁকে স্মরণে রাখবে।

বাঙলা ভাষার মানরূপ প্রতিষ্ঠার কোনো লক্ষ্য ছিলো না আসসুম্পসাঁউর। ভাওয়ালের যে-দরিদ্রের দরোজায় তিনি পৌঁছে দিচ্ছিলেন তাঁর করুণাময়ের করুণ শহীদ পুত্রকে, তাদের দরজা থেকে আসসুম্পসাঁউ সংগ্রহ করেছিলেন আঞ্চলিক সমাজের দৈনন্দিন শব্দ। লিপিবদ্ধ করেছিলেন ওইসব শব্দ রোমান অক্ষরে। তাই আঞ্চলিক শব্দে পূর্ণ তাঁর অভিধান। 'আকল', 'বাদাম', 'আলিয়া', 'আলগুছি', 'চামচারা', 'আটকল', 'আষ্ট', 'আজৈন', 'বাও' প্রভৃতির মতো শব্দে ভ'রে আছে ওই অভিধান। তাঁর অভিধানটি বিশেষ প্রচারিত হয় নি। সেটি একটি গোপন গ্রন্থের মতো থেকে গিয়েছিলো পর্তুগিজ ধর্মযাজকদের মধ্যে। তাই এটি বাঙলা ভাষার বিকাশে কোনো ভূমিকা পালন করে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পর ইংরেজরা দেখা দেন অভিধানপ্রণেতারূপে। আঠারোশতকের শেষ দশকে। তারা বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধন আর বিকাশ ঘটানোর জন্যেই রচনা করেন অভিধান। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো বাঙলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার আধুনিক রূপ; আর ভারতের সব ভাষার মধ্যে বাঙলাই শ্রেষ্ঠ। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে বাঙলা ভাষাকে উন্নত ভাষায় পরিণত করতে হ'লে উদারভাবে শব্দ ঋণ করতে হবে সংস্কৃত থেকে। অভিধানে তাঁরা সংকলন করেছেন প্রচুর পরিমাণে আটপৌরে শব্দ; কিন্তু সংস্কৃত শব্দ সংকলন করেছিলেন এতো বিপুল পরিমাণে যে তাদের ভেতর যেনো লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো দৈনন্দিন শব্দরাশি। তাঁরা অনেক শব্দের ভুল রূপকে শুদ্ধ রূপ মনে করেছিলেন, অনেক শব্দের দিয়েছিলেন ভুল অর্থ। কিন্তু তা তাঁদের কৃতিত্বের তুলনায় সামান্য। তাঁরাই প্রথম স্থির করতে উদ্যোগী হন বাঙলা শব্দের বানান, অর্থ নির্দেশ করার চেষ্টা করেন প্রাণপণে, আর সংস্কৃত থেকে ধার ক'রে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেন বাঙলা শব্দের ভাণ্ডার। তাঁদের পরে যখন দেশি পণ্ডিতেরা বাঙলা ভাষার অভিধান সংকলনে উদ্যোগী হন, তখন বহুগুণে বেড়ে যায় সংস্কৃত শব্দ। মনে হয় তাঁরা যেনো বাঙলা ভাষার অভিধান সংকলন করতে ব'সে রচনা করেছিলেন সংস্কৃত ভাষার অভিধান। তাঁদের বহু শব্দ হয়তো কখনোই কেউ ব্যবহার করে নি; কিন্তু প্রচুর পরিমাণ শব্দ পত্রপত্রিকায়, সাহিত্যে ও চিন্তামূলক রচনায় ব্যবহৃত হয়ে গৃহীত হয়ে যায়। আঠারোশতকের শেষ ও উনিশশতকের প্রথমদিকের অভিধানপ্রণেতারা সচেতনভাবে পালন করেন বাঙলা ভাষার মানরূপ পরিকল্পনাকারীর ভূমিকা। তাঁদের ওই প্রচেষ্টা ছাড়া বাঙলা ভাষার বিকাশ এতো দ্রুত ঘটতো না।

'ইংরাজ ও বাঙ্গালি লোকের সিখিবার কারণ এক বহি' বেরোয় ১৭৯৩ অব্দে। 'বহি'টির নাম *ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি*। এটি একটি বাঙলা-ইংরেজি শব্দকোষ বা অভিধান। অভিধানটির সংকলকের নাম মুদ্রিত হয় নি অভিধানে; মুদ্রিত হয়েছে প্রকাশকের নাম। কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছিলেন আপজন সাহেব। এটিকেই ধরতে পারি বাঙলা ভাষার প্রথম পরিকল্পিত অভিধান ব'লে। এর কয়েক বছর পর, ১৭৯৯ ও ১৮০২ অব্দে, দু-খণ্ডে, বেরোয় বাঙলা ভাষার প্রথম উচ্চাশী অভিধান। সংকলক ছিলেন হেনরি পিটস ফরস্টার। দু-খণ্ডের বিশাল অভিধান এটি। প্রথম খণ্ডটি ইংরেজি-বাঙলা, আর দ্বিতীয় খণ্ডটি বাঙলা-ইংরেজি অভিধান। ফরস্টার উচ্চাশী ছিলেন; ভালোবেসেছিলেন বাঙলা ভাষাকে। তাঁর ইচ্ছে ছিলো বাঙলা ভাষাকে বিকশিত করার। প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন হেনরি পিটস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরস্টার। তাঁর অভিধানের আকার, অক্ষরের রূপ দেখলেই বিস্মিত হ'তে হয়। ইংরেজি-বাঙলা অংশে তিনি একেকটি ইংরেজি শব্দ নিয়েছিলেন, আর একের পর এক দিয়েছেন তার বাঙলা প্রতিশব্দ। নির্দেশ করেছেন উচ্চারণ। বানানও অনেকটা স্থির করেছেন তিনি। কিছুকিছু প্রতিশব্দ হয়তো ভুল হয়েছিলো তাঁর; কোনোকোনো ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ মার্জিত শব্দের পাশাপাশি বসিয়েছেন তথাকথিত অমার্জিত শব্দ। খুব শিউরে উঠতে হয় তাঁর অভিধান পড়ার সময়; তাতে মুখোমুখি হই এমন সব শব্দের, যাদের মুখোমুখি হওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা।

উইলিয়ম কেরি। স্মরণীয় তিনি বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে, অবিস্মরণীয় বাঙলা অভিধানের ইতিকথায়। ফরস্টারের পর দেড় দশকের মধ্যে যখন বেরোয় উইলিয়ম কেরির বিশাল অভিধান, তখন নিশ্চয়ই বাঙলা ভাষা তাঁর দিকে তাকিয়েছিলো মুগ্ধ, বিস্মিত, কৃতজ্ঞ চোখে। কেরির অভিধানের নাম *এ ডিকশনারি অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন হুইচ দি ওয়র্ডস আর ট্রেসড টু দেয়ার অরিজিন, অ্যান্ড দেয়ার ভেরিয়াস মিনিংস গিভেন*। এর প্রথম খণ্ড বেরোয় ১৮১৫-তে; দশ বছর পর ১৮২৫-এ বেরোয় দ্বিতীয় খণ্ড। কেরির অভিধান অনেক বেশি সুদৃশ্য ও সুশৃঙ্খল ফরস্টারের অভিধানের চেয়ে। শব্দের পরিমাণও অনেক বেশি, বিচ্যুতিও অনেক কম। তিনি প্রায় স্থির ক'রে ফেলেন অধিকাংশ বাঙলা শব্দের সংস্কৃতানুসারী বানান। সে-কালের প্রধান গদ্যলেখকদের বানানে যে-অস্থিরতা দেখা যায়, তা নেই এ-অভিধানে। কেরি বহু শব্দ নিয়েছেন সংস্কৃত অভিধান থেকে, বহু শব্দ নিয়েছেন বাস্তব জীবন থেকে, এবং নিজে তৈরি করেছেন প্রচুর শব্দ। এমন অনেক শব্দ পাই তাঁর অভিধানে যা অভিধানে জায়গা পাওয়ার যোগ্য নয়, কেননা সেগুলো ব্যাকরণের সূত্র দিয়েই তৈরি করা যায়। কেরির অভিধান বেশ সুস্থিত ক'রে দেয় বহু বাঙলা শব্দের রূপ ও বানান; এবং আধুনিক বাঙলা মানভাষার বিকাশে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কেরি যদি বাঙালি হতেন, তাহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন আরো বেশি। মহিমা পেতেন বাঙলা ভাষার প্রধান অভিধানপ্রণেতার। তাঁকে বলতাম বাঙলা অভিধানের জনসন।

উনিশশতক ছিলো অভিধানের শতাব্দী। দশকেদশকে বেরিয়েছে দ্বিভাষিক ও একভাষিক অভিধান; এবং বহুভাষিক অভিধানও বেরিয়েছে কয়েকটি। এসব অভিধান আনুশাসনিক; অর্থাৎ এগুলোর উদ্দেশ্য ছিলো বাঙলা শব্দের শুদ্ধ রূপ, বানান, অর্থ প্রভৃতি নির্দেশ করা। উনিশশতকে যখন গদ্য বিকশিত হচ্ছিলো রচনায় রচনায়, বাঙলা ভাষা অর্জন করছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানরূপ, তখন এ-সমস্ত অভিধান সরাসরি সাহায্য করেছে বাঙলা ভাষার মানরূপ সুস্থিতিতে। কেরির পরে দুটি বিশাল অভিধান সংকলন করেছিলেন চার্লস গ্রেভস হটন ও রামকমল সেন। হটনের "এ ডিকশনারি, বেঙ্গলি অ্যান্ড স্যানসক্রিট" বেরিয়েছিলো ১৮৩৩-এ। রামকমল সেনের "এ ডিকশনারি ইন ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি" বেরিয়েছিলো ১৮৩৪-এ। উনিশশতকে আর যাঁরা উল্লেখযোগ্য অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তাঁরা হলেন পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮০৯), জন মেনডিস (১৮২২), জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক (১৮৩১), মথুরানাথ তর্করত্ন (১৮৬৩)। বিশশতকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অভিধান সংকলন করেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে উনিশশতকে বিভিন্ন অভিধান যে-ভূমিকা পালন করে বাঙলা ভাষার বিকাশে বিশশতকে তা পালন করে নি কোনো অভিধান। উনিশশতকে অভিধান ও বাঙলা ভাষার বিকাশ ছিলো ঘনিষ্ঠ ব্যাপার। বিশশতকে আর তা নেই। একটি অবিকশিত ভাষাকে অভিধান যতোটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিকশিত ভাষাকে ততোটা পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকরণের কথা

১

শুদ্ধতার ধারণাটি প্রাণের মতো বিরাজ করে একটি গ্রন্থে। ওই গ্রন্থকে বলা হয় ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বইয়ের পাতায় পাতায় একটা স্বর যেনো অবিরাম ব'লে যেতে থাকে এটা শুদ্ধ, ওটা শুদ্ধ, সেটা শুদ্ধ; আর এটা অশুদ্ধ, ওটা অশুদ্ধ, সেটা অশুদ্ধ। চাই শুধু শুদ্ধতা। ব্যাকরণের প্রতিটি পৃষ্ঠা, প্রতিটি সূত্র শ্লোগানের মতো বলে এ-কথা। ব্যাকরণের উৎপত্তিই ঘটেছিলো ভাষার কোন শব্দটি শুদ্ধ আর কোনটি অশুদ্ধ, তা নির্দেশ করার জন্যে। কোনো একটি জাতি যখন নিজের ভাষার মানরূপ স্থির করতে চায়, দূর করতে চায় ভাষার নানা রকম বিশৃঙ্খলা, তখন তাদের মধ্যে উৎসাহ দেখা দেয় ব্যাকরণ রচনার। এমন উৎসাহ দেখা গিয়েছিলো প্রাচীন গ্রিসে, পুরোনো ভারতে, আঠারোশতকের ইংল্যান্ডে। ব্যাকরণবিদেরা খুঁজেখুঁজে বের করেন নানা সূত্র, বহু নিয়ম। ভাষার কিছুকিছু ব্যাপারকে তাঁরা ঘোষণা করেন অশুদ্ধ ব'লে। অন্যরা মেনে নেয় ব্যাকরণরচয়িতার অনুশাসন। তখন ভাষা পেতে থাকে স্থির সুস্থিত রূপ। যে-ব্যাকরণ ভাষার নিয়মকানুনসূত্র স্থির ক'রে দেয়, শুদ্ধ প্রয়োগের বিধান দেয়, তাকে বলা হয় 'আনুশাসনিক ব্যাকরণ'। এর অন্য নাম 'প্রথাগত ব্যাকরণ'। আধুনিক কালে অবশ্য জন্ম নিয়েছে নতুন এক ধরনের ব্যাকরণ, যা শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে বলে না কিছু; শুধু বর্ণনা করে, কেবল ব্যাখ্যা করে। কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণের জন্ম হয়েছিলো ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ শেখানোর উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষ খুব বিখ্যাত ব্যাকরণের জন্যে। এ-অঞ্চল পরিপূর্ণ পাণিনিতে আর পতঞ্জলিতে। কিন্তু আদিযুগে আর মধ্যযুগে কোনো বাঙালি বোধ করে নি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনার উৎসাহ। ব্যাকরণবিদেরা সব ব্যস্ত ছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ নিয়ে।

বাঙলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর কোনো আগ্রহ ছিলো না পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁউর। তাঁর আগ্রহ ছিলো জেসাসের ধর্ম প্রচারে। তবুও তিনিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণরচয়িতা। ১৭৪৩ অব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে বেরিয়েছিলো তাঁর যে-অভিধানটি, তাতে পাদ্রি আসসুম্পসাঁউ জুড়ে দিয়েছিলেন একখানি সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, বাঙলা ব্যাকরণ্। ব্যাকরণটি সংক্ষিপ্ত, খণ্ডিত, অপরিকল্পিত। আসসুম্পসাঁউর অভিধান-ব্যাকরণ ছিলো খুবই লাজুক; চোখের আড়ালে গোপনে থেকে গেছে আঠারো আর উনিশ শতক। তাই তা কোনো উপকারে আসে নি বাঙালি ও বাঙলা ভাষার। কিন্তু তা খুব উপকার করেছে রচয়িতার। এ-যুগল গ্রন্থ রচয়িতার জন্যে মরলোকে এনে দিয়েছে অমরতা।

১৭৭৮। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড। বাঙলা ব্যাকরণ। ঢালাই করা বাঙলা বর্ণমালা। চারটি ব্যাপার—অব্দ, ব্যক্তি, ভাষা, মুদ্রণ—একসাথে দেখা দিয়েছিলো বাঙলা ভাষার জীবনে। ওই বছর ইংরেজ হ্যালহেড প্রকাশ করেন বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাপক ও পরিকল্পিত ব্যাকরণপুস্তক। হুগলি থেকে বেরিয়েছিলো তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণ *এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ*। ১৭৭৮ অব্দে। সব দিক থেকেই চমৎকার বই হ্যালহেডের ব্যাকরণটি। ছাপা ঝকঝকে, অক্ষরগুলো সুশ্রী সুন্দর। এ-ব্যাকরণের জন্যেই প্রথম ধাতুতে ঢালাই হয় বাঙলা বর্ণমালা। বাঙলা ভাষা ঢালাই করা অক্ষরে মুদ্রাযন্ত্রস্থ হয় এ-ব্যাকরণেই সর্বপ্রথম। হ্যালহেডের বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ অতি-উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে বাঙলা ব্যাকরণ ও মুদ্রণের ইতিহাসে। ব্যাকরণরচয়িতা হিশেবেও চমৎকার ছিলেন হ্যালহেড। ভালোবেসেছিলেন তিনি বাঙলা ভাষাকে; বাসনা ছিলো তাঁর বাঙলা ভাষাকে একটি বিকশিত ভাষায় পরিণত করার। হ্যালহেড বাঙলা ভাষার প্রথম প্রথাগত ব্যাকরণবিদ, যিনি কিছু নিয়ম স্থির ক'রে দিতে চেয়েছিলেন বাঙলা ভাষার। হ্যালহেড থেকেই সূচনা ঘটে ধারাবাহিক ব্যাকরণ রচনার; প্রথমে ইংরেজি ভাষায়, পরে বাঙলা ভাষায়।

বাঙলা ভাষার আদি ব্যাকরণপ্রণেতারা বিদেশি ও বিভাষী। তাঁরা লাতিন ও ইংরেজি ব্যাকরণের আদলে রচনা করেন বাঙলা ব্যাকরণ। তারপর আসেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। তাঁরা বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুষ্ট মেয়ে ভেবে তাকে সৎপথে আনার জন্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের কাঠামোতে রচনা করতে থাকেন বাঙলা ব্যাকরণ। আর বাঙলা ভাষা, তার স্বভাব অনেকটা সোনার মতো, কখনো এদিকে কখনো ওদিকে বেঁকে না-ভেঙে লাভ করতে থাকে নিজের চরিত্র। উনিশশতকের প্রথাগত ব্যাকরণরচয়িতারা অনেক নিয়ম স্থির ক'রে দিয়েছিলেন বাঙলা ভাষার। তার কিছুটা মেনেছে বাঙলা ভাষা, মানে নি কিছুটা। এগিয়েছে সামনের দিকে। তারপর উনিশশতকের শেষ দশকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা দেন একদল ব্যাকরণবিদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং আরো অনেকে। তাঁরা বাঙলা ভাষাকে দেখতে চান বাঙলা হিশেবেই, সংস্কৃতরূপে নয়। তাঁরা খুঁজে বের করেন বাঙলা ভাষার বহু একান্ত আপন বৈশিষ্ট্য।

হ্যালহেডের পর একটি ধারা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো বাঙলা ব্যাকরণ রচনার। উনিশশতকের শুরুতেই বেরোয় উইলিয়ম কেরির ব্যাকরণ *এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ*। তিনি আর হ্যালহেডের মতো বাঙলাকে 'বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' বলেন নি, বলেছেন, 'বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। তারপর ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণ লেখেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬), জেমস কিথ (১৮২১), রামমোহন রায় (১৮২৬)। বাঙলা ভাষায় যে-বাঙালি প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ রচনা করেন, তাঁর নাম রামমোহন রায়। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ অব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর "গৌড়ীয় ব্যাকরণ"। উনিশশতকে আরো অনেকে লিখেছিলেন বাঙলা ব্যাকরণ। তাঁদের মধ্যে আছেন শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, যদুনাথ ভট্টাচার্য, শ্যামাচরণ সরকার, ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, এবং আরো অনেকে। তাঁদের ব্যাকরণ ছিলো ছাত্রপাঠ্য : ইংরেজদের ও বাঙালি কিশোর-তরুণ ছাত্রদের বাঙলা শেখানোর জন্যেই রচিত এগুলো। ত্রুটিও আছে অনেক। তবু এ-ব্যাকরণরাশি নানাভাবে সাহায্য করেছিলো বাঙলা ভাষার মানরূপ সুস্থিতিতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সব বঙ্গেত জন্মি

বাঙালি মুসলমানেরা একটি শ্রেণী কয়েক শো বছর ধ'রে ভুগেছে, এমনকি এখনো ভুগছে, একটি দুষ্ট রোগে। এতো বেশি দিন ধ'রে রোগে ভোগার ইতিহাস পৃথিবীতে বেশি নেই। ওই শ্রেণীটি মোটামুটিভাবে সমাজের ওপরের শ্রেণীর। দালাল, সুবিধাবাদী, স্বার্থপরায়ণ, দেশের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষে গ'ড়ে উঠেছিলো বাঙালি মুসলমানের ওই শ্রেণীটি। তারা যে-রোগে ভুগেছে, সে-রোগের নাম দিতে পারি 'নিজেদের-সম্পর্কে-ভুল-ধারণা'। আত্মভ্রমরোগে অসুস্থ বাঙালি মুসলমান। বাঙালি মুসলমান বাঙালি, এ-দেশেরই মানুষ তারা। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে, তলোয়ার ঘুরিয়ে, মারমার কাটকাট শব্দ ক'রে কোনো রোদে-পোড়া মরুভূমি থেকে আসে নি। মাতাপিতামহক্রমে তাদের বঙ্গেত বসতি। বাঙলার পলিমাটিতেই তাদের জন্ম। বাঙলার গাছের ছায়া, আকাশের মেঘ, সবুজ সোনালি ধানের খেতের স্নেহআদরেই লালিত তাদের জীবন চিরকাল। কিন্তু পলিমাটির এ-বদ্বীপে সব সময়ই আগাছার মতো উল্লাসে জন্ম নিয়েছে একগোত্র সুবিধাবাদী মানুষ। দালালি তাদের এনে দিতো শক্তি আর সম্পদ। সমাজের উঁচু শ্রেণীটিই সাধারণত ভরা থাকে কাতারে কাতারে দালাল আর সুবিধাবাদীতে। চিরকালই ছিলো, আজো আছে। ওই শ্রেণীটি বাঙলাকে মেনে নিতে পারে নি তাদের দেশ হিশেবে, মাতৃভাষা হিশেবে মেনে নিতে পারে নি বাঙলাকে। বাঙলার পাতার কুটিরে শুয়ে তারা স্বপ্ন দেখেছে ইরানতুরানের। মরুভূমি ভেসে উঠেছে চোখে। কখনো আরবিকে, কখনো ফারসিকে, আবার কখনো উর্দুকে মনে করেছে নিজেদের ভাষা ব'লে। ভুগেছে মানসিক অসুখে; আর নানাভাবে শত্রুতা করেছে বাঙলার সাথে।

বাঙলার সাথে বাঙালি মুসলমানের এ-শ্রেণীটির শত্রুতা শুরু হয়ে গিয়েছিলো মধ্যযুগেই। কিন্তু বিশাল বাঙালি মুসলমানেরা ভুলেও ভাবে নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ছাড়া আর কোনো ভাষা আছে তাদের। এ-ভাষাতেই তো তারা প্রথম মাকে মা, বাবাকে বাবা (হায়, 'বাবা' শব্দটি বাঙলা নয়, তুর্কি!) বলেছে। সুখে উল্লাস প্রকাশ করছে বাঙলা ভাষায়, তাদের বেদনার কাতরতা নীল হয়ে ঝরেছে বাঙলা ভাষায়। কিন্তু উঁচু শ্রেণীটি তাদের শেখাতে চায় অন্য কথা। এতে সতেরো শতকেই আগুনের মতো জ্ব'লে উঠেছিলেন একজন কবি। আবদুল হাকিম। *নুরনামা* কাব্যে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন বাঙলা বিদ্বেষীদের :

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়॥
মাতাপিতামহক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মান হিত অতি॥

কী তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণ শত্রুদের প্রতি, আর মমতা আপন ভাষার প্রতি!

উনিশশতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে দেখা যায় 'যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী', তারা শুধু মুসলমান নয়, একগোত্র হিন্দুও যোগ দিয়েছে তাদের সাথে। মুসলমান বাঙালিরা প্রথম স্বপ্ন দেখতো আরবি ফারসি উর্দুর, পরে লেখাপড়া শিখে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ইংরজিরও। হিন্দু বাঙালির একটি শ্রেণী—শিক্ষিত, সুবিধাবাদী, পরগাছা শ্রেণীটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ইংরেজির। তার ফলে আমাদের সমাজে সব সময়ই একটি শ্রেণী পাওয়া গেছে যারা কোনো বিদেশি ভাষার দাস। তারা ধনী, সুবিধাবাদী, দালাল। শোষণে আর শাসনে সব সময়ই উৎসাহী। এখনকার বাঙলাদেশে এ-শ্রেণীটির তৎপরতা চোখে পড়ে খুব। তারা বাঙলার সম্পদ অনেকটা লুট ক'রে বিলাসে জীবন কাটায়। বাঙলা ভাষাকে অবহেলা ক'রে দাস হয়ে থাকে ইংরেজির। দুটি সাম্রাজ্যবাদ বাঙলায় দুবার দালাল সৃষ্টি করেছে। মধ্যপ্রাচ্যীয় সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে একবার, বিলেতি সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে আরেকবার। ওই সাম্রাজ্যবাদের দালালেরাই সব সময় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে বাঙলা ও বাঙলা ভাষার শত্রুরূপে। তারা বিদেশ ও বিদেশি ভাষার ভৃত্য।

বাঙলার সাথে বাঙালি মুসলমানের ওই শ্রেণীটির শত্রুতা বেশ ক্ষতি করেছে বাঙালি মুসলমানের। অনেক শক্তি, অনেক রক্ত অপচয় হয়েছে কলহে, ক্রোধে; আর প্রতিবাদে আর সংঘর্ষে। ধীরেধীরে এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে গেছে যে বাঙালির, বাঙালি মুসলমানের, ভাষা বাঙলা। সত্যটা ছিলো শুরু থেকেই, কিন্তু তা মেনে নিতে চ'লে যায় দীর্ঘ সময়। ওই কলহে বিশশতকের কয়েক দশক ধ'রে বাঙলাবিরোধী শ্রেণীটি উর্দুকে গণ্য করেছে তাদের ভাষা ব'লে। কিন্তু বাঙলাপন্থীরা নানাভাবে দেখিয়েছেন যে বাঙলাই বাঙালির ভাষা। বাঙালি মুসলমান বাঙালি। বাঙালির ভাষা বাঙালা। হামেদ আলি লিখেছিলেন :

> আমাদের পূর্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান, অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশীয় হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা। তাহাঁরা (বাঙলার শত্রুরা) বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটীরে নিদ্রা যাইয়াও এখনও বোগদাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ আবার বাঙ্গালার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর। দুর্বল ব্যক্তিরা যেমন অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করে, অধঃপতিত জাতিও তেমনি অস্বাভাবিক খেয়াল আঁটিয়া থাকে।

বিশশতকের শুরুর দিকে (১৩১৬) আমাদের একটি শ্রেণীর অদ্ভুত পাগলামোর কথা বলেছিলেন হামেদ আলী। আর বিশশতকের মাঝামাঝি একটি অদ্ভুত দেশ, পাকিস্তান, আঁটে অস্বাভাবিক খেয়াল। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাঙলাদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিলো অদ্ভুত পাকিস্তানের। বাঙালিকে, বাঙলাকে বিনষ্ট করাই ছিলো পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য।

পাকিস্তান ছিলো একটি মধ্যযুগীয় প্রগতিবিরোধী দেশ। সেখানে ক্ষমতা দখল করতো দেশের অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মানুষেরা; আর বড়োবড়ো শরীরের সেনাপতিরা। অস্ত্র আর চক্রান্ত ছিলো সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার পাকিস্তানে। পাকিস্তানের সিংহাসন যারা দখল করেছিলো, শুরু থেকেই তাদের মনে হয়েছিলো পাকিস্তান টিকবে না। তাদের ভয় ছিলো বাঙালিদের। তাই শুরু থেকে পাকিস্তান চক্রান্ত করে বাঙলা ও বাঙালির বিরুদ্ধে। চারদিক থেকে পাকিস্তানি শাসকেরা আক্রমণ করে বাঙলা ভাষাকে। কখনো তারা বাঙলা ভাষার লিপি বদলাতে চায়। বাঙলা বর্ণমালার বদলে চাপিয়ে দিতে চায় ইংরেজি, আরবি অক্ষর। কখনো বানান সহজ করার নামে চক্রান্ত করে বাঙলার বিরুদ্ধে। কখনো বাঙলা ভাষাকে পৌত্তলিক নাম দিয়ে বাঙালি মুসলমানকে বিমুখ ক'রে তুলতে চায়। এবং রাষ্ট্রভাষার নামে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চায় বাঙালির ওপর। বাঙালিরা যদি গ্রহণ করতো উর্দুকে, মেনে নিতো পাকিস্তানি চাপ, তাহলে বাঙলা ভাষা এগোতো অবলুপ্তির দিকে। কিন্তু বাঙালি তা হ'তে দেয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের জন্মের এক মাস আগেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় বাঙলার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রস্তাব করে যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এতেই সূচনা ঘটে একটি আন্দোলনের। ওই আন্দোলনের প্রথম বড়ো পরিণতি উনিশশো বায়ান্নোর বিদ্রোহ; এবং পরম পরিণতি একাত্তরের স্বাধীনতা। সাতচল্লিশে ভারত ভেঙে দুটি দেশের উদ্ভব ঘটে। তার একটি পাকিস্তান। পাকিস্তানে যার প্রতাপ ছিলো নিরঙ্কুশ, তার নাম মুহম্মদ আলি জিন্না। জিন্নাই পাকিস্তানে প্রথম বাঙলার সাথে শত্রুতা শুরু করে। আর তাকে অনুসরণ করে অন্যরা। পাকিস্তানের শুরু থেকেই আন্দোলন শুরু হয়ে যায় বাঙলার পক্ষে, বাঙলাদেশে। ১৯৪৮-এ জিন্না ঢাকা এসে ঘোষণা করে যে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোনো ভাষা নয়'। প্রতিবাদ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তারা দাবি করে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে বাঙলাকে স্বীকৃতি দেয়ার।

একটি জাতির ভাষা শুধু পরস্পরের সাথে কথা বলার মাধ্যম নয়। ভাষা জড়িত তার অস্তিত্বের সাথে। ওই ভাষাটিকে কেড়ে নিলে বা পর্যুদস্ত করা হ'লে জাতিটির অস্তিত্বও বিনাশের মুখোমুখি হয়। পাকিস্তানের শুরুতে বাঙালির অবস্থাও হয়েছিলো অমন। তাই তাদের প্রতিবাদ করতে হয়েছে, গ'ড়ে তুলতে হয়েছে আন্দোলন। এ-আন্দোলনে ছাত্ররাই নেয় সক্রিয় ভূমিকা। বাঙলা ভাষার লেখকেরা কাজ করেন আন্দোলনের মূলে। তাঁরা দেখিয়ে দেন বাঙলা রাষ্ট্রভাষা না হ'লে কীভাবে পর্যুদস্ত হয়ে যাবে বাঙালি। তাঁদের বাণী গ্রহণ ক'রে প্রতিরোধে উদ্যত হয় ছাত্ররা ও অন্যরা।

তবে বাঙলার সাথে চক্রান্ত করেছে বহু বাঙালিও। খাজা নাজিমুদ্দিন, নূরুল আমিন, ফজলুর রহমান নানাভাবে বাঙলার বিরুদ্ধে কাজ করে। এবং ১৯৫২-র ৮ই ফাল্গুনে, ২১-এ ফেব্রুয়ারিতে, বৃহস্পতিবারে, ঢাকার রাজপথে ঝ'রে পড়ে ছাত্রদের রক্ত। তাদের অপরাধ তারা বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিশেবে চেয়েছিলো। রক্তে লাল হয়ে ওঠে বাঙলাদেশ। সেদিনই বোঝা যায় পৃথিবীতে একটি নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম আসন্ন। উনিশ বছর পরই জন্ম নেয় সে-দেশটি। বাঙলাদেশই সে-অনন্য দেশ পৃথিবীর, যার জন্মের মূলে কাজ করেছে ভাষা। আছে আরো একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বাঙলাদেশই সম্ভবত একমাত্র দেশ, যার নাম ভাষার নামে। বাঙলা-দেশ। ভাষা বাঙলা, দেশও বাঙলা। পৃথিবীর একটিমাত্র দেশের রাষ্ট্রভাষা বাঙলা। সেটা এই দুঃখিনী নষ্টভ্রষ্ট অপরাজেয় বাঙলাদেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষা : তোমার মুখের দিকে

তোমার মুখের দিকে আমি সব সময়ই তাকিয়ে আছি।

যখন জেগে থাকি তখন তোমার দিকে স্থির ক'রে রাখি চোখ। স্থির ক'রে রাখি অস্তিত্ব।

যখন ঘুমোই তখন তোমার দিকে ধ'রে রাখি দুটি চোখ। স্থির ক'রে রাখি স্বপ্ন।

তুমি আর আমি একই গোত্রের। শ্যামলী রূপসী।

শাঁইশাঁই চাবুকের শব্দ শুনি। চাবুকের শাঁইশাঁই শব্দে গান হয়ে বেজে উঠছে এক হাজার একশো বছর।

শুধু চাবুকের শব্দ শুনি।

শেকলে বাঁধা উদ্ধত দুর্বিনীত প্রাকৃত মানব। ঝনঝন ক'রে ওঠে অজগরের মতো স্তরেস্তরে শেকল আর শেকল আর শেকল।

শেকলের শব্দে অর্কেস্ট্রার মতো বেজে ওঠে এক হাজার একশো বছর।

শুধু শেকলের শব্দ শুনি।

তুমি আর আমি সে-গোত্রের যারা চিরদিন উৎপীড়নের মধ্যে গান গায়।

হাহাকার রূপান্তরিত হয়ে সঙ্গীতে শোভায়।

আমি চারদিকে শোভা দেখি।

সঙ্গীতে শিহরিত দেখি লোকালয় বন আর প্রান্তর।

তোমার অশ্রুবিন্দু পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুক্তোর চেয়েও সুন্দর। তোমার পিঠের চাবুকের দাগ সবচেয়ে উজ্জ্বল জড়োয়ার চেয়েও উজ্জ্বল।

তুমি তাকালেই সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ে সূর্যাস্তে, চন্দ্রোদয়ে। শিশিরে, সমুদ্রে, বুনোঘাসে, কবিতার পংক্তিতে।

তোমার অ, আ চিৎকার সমস্ত আর্যশ্লোকের চেয়েও পবিত্র অজর।

তোমার দীর্ঘশ্বাসের নাম চণ্ডীদাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতাব্দীকাঁপানো উল্লাসের নাম মধুসূদন
তোমার থরোথরো ভালোবাসার নাম রবীন্দ্রনাথ
বিজন অশ্রুবিন্দুর নাম জীবনানন্দ
তোমার বিদ্রোহের নাম নজরুল ইসলাম
তোমার রূপের আমি কোনো সীমা পাই না।

যখন শৈশবে আমার বুক থেকে স্বপ্ন থেকে প্রথম মুখর হয়ে উঠেছিলে, তখন মনে হয়েছিলো এ-ই পৃথিবীতে প্রথম বাণী এলো।

মা বলার সাথে সাথে তুমি আর অদ্বিতীয় আরেকজন এক হয়ে গিয়েছিলে।

জননী জননী।

তারপর তুমি আমার চাঞ্চল্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছো মাঠে মাঠে আকাশে আকাশে। আমার দুঃখ হয়ে কেঁপে উঠেছো আত্মায়।

আমার স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছো গ্রন্থে।

এক সময় দেখি তুমি আর আমার অস্তিত্ব এক হয়ে গেছে।

সুখে দুঃখে উদ্ধত বিদ্রোহে পরাজয়ে আর বিজয়ে অভিন্ন আমরা।

হাজার বছর ধ'রে। হাজার বছর পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

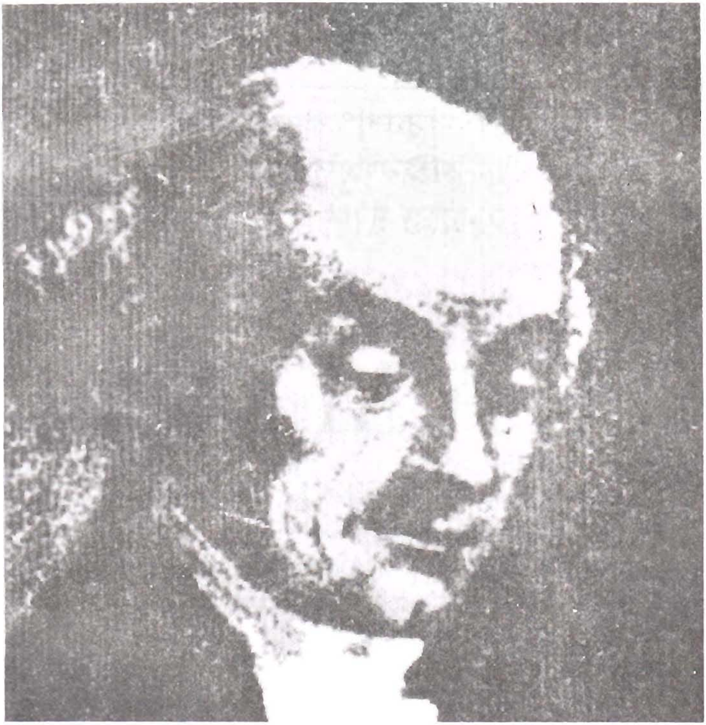

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড ঃ বাঙলা ভাষার প্রথম প্রধান ব্যাকরণ রচয়িতা।

রামকমল সেন ঃ তিনি সংকলন করেছিলেন "এ ডিকশনারি ইন ইংলিশ অ্যাণ্ড বেঙ্গলি" নামক এক অসাধারণ অভিধান।

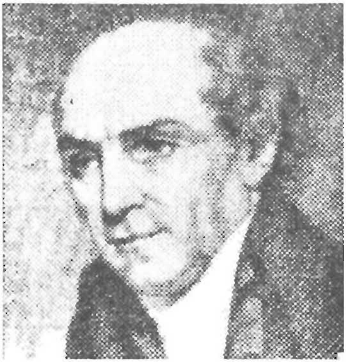

উইয়িম কেরি ঃ তিনি সংকলন করেছিলেন এক অতুলনীয় ইংরেজি বাঙলা অভিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী

A

GRAMMAR

OF THE

BENGAL LANGUAGE

BY

NATHANIEL BRASSEY HALHED

ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দবারিধেঃ।
প্রক্রিয়ান্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং।।

PRINTED

AT

HOOGLY IN BENGAL

M DCC LXXVIII.

হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থ "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ"-এর (১৭৭৮) আখ্যাপত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

A

VOCABULARY,

IN TWO PARTS,

ENGLISH AND BONGALEE,

AND

VICE VERSA.

BY H. P. FORSTER.

SENIOR MERCHANT ON THE BONGAL ESTABLISHMENT.

VOX ET PRAETEREA NIHIL.

DACCA
UNIVERSITY
LIBRARY.

FROM THE PRESS OF FERRIS AND CO.

1799.

RARE BOOK

হেনরি পিট্স্ ফরস্টার-এর অভিধান "এ ভোকাবুলারিও, ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যাণ্ড বোঙ্গালি'র (১৭৯৯) আখ্যাপত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

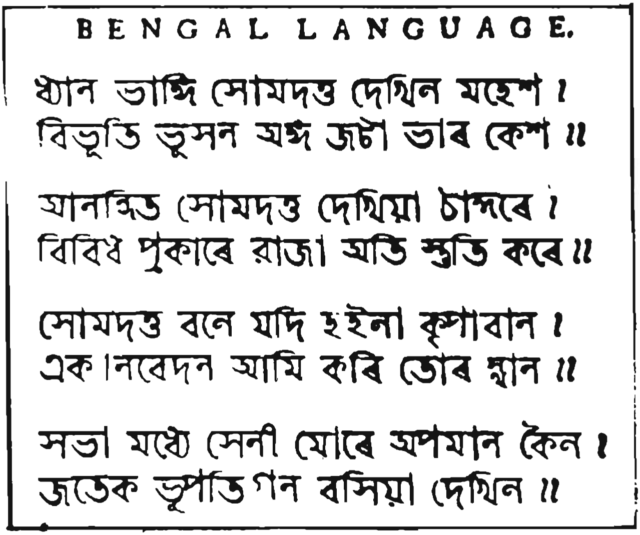

BENGAL LANGUAGE.

ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিল মহেশ।
বিভূতি ভুসন অঙ্গ জটা তার কেশ॥

আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া চাঙ্গরে।
বিবিধ পৃকারে রাজা অতি স্তুতি করে॥

সোমদত্ত বলে যদি হইলা কৃপাবান।
এক নিবেদন আমি করি তোর স্থান॥

সভা মধ্যে সেনী মোরে অপমান কৈল।
জতেক ভূপতি গন বসিয়া দেখিল॥

হ্যালহেডের ব্যাকরণে মুদ্রিত বাংলা বর্ণমালা।

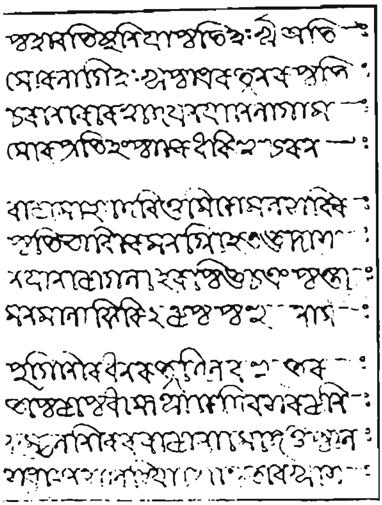

মধ্যযুগের একটি পুথির লিপি।

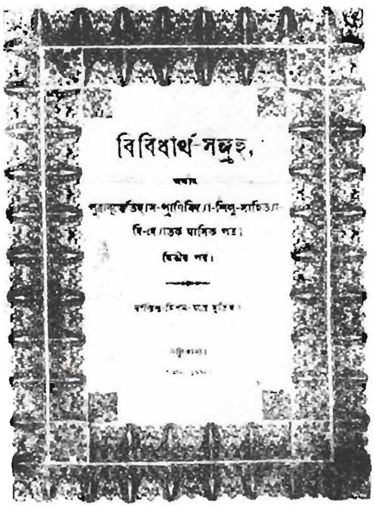

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ-এর বাঙলা মাসিক পত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১৮৫১)-এর আখ্যাপত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বাঙলা সাধুরীতি তাঁর হাতে লাভ করে সুস্থিতি।

রামমোহন রায় ঃ ১৮৩৩-এ বেরোয় তাঁর "গৌড়ীয় ব্যাকরণ"। বাঙলা ভাষায় লেখা এটি প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ "চর্যাপদ"-এর আবিষ্কারক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তিনি শুধু বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি নন, বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা রূপান্তরিত হয়ে বঙ্গীয় অঞ্চলে জন্ম নিয়েছিলো এক মধুর- কোমল- বিদ্রোহী প্রাকৃত। তার নাম বাঙলা। ওই ভাষাকে কখনো বলা হয়েছে 'প্রাকৃত', কখনো বলা হয়েছে ' গৌড়ীয় ভাষা'। কখনো বলা হয়েছে 'বাঙ্গলা', বা 'বাঙ্গালা'। এখন বলি 'বাঙলা' বা 'বাংলা। এ-ভাষায় লেখা হয় নি কোনো ঐশী শ্লোক: এ-ভাষা স্নেহ পায় নি প্রভুদের। কিন্তু হাজার বছর ধ'রে এ-ভাষা বইছে আর প্রকাশ করছে অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তব। বৌদ্ধ বাউলেরা বাঙলা ভাষায় রচনা করেছেন দুঃখের গীতিকা; বৈষ্ণব কবিরা ভালোবেসেছেন বাঙলা ভাষায়। মঙ্গল কবিরা এ- ভাষায় গেয়েছেন লৌকিক মঙ্গলগান। এ-ভাষায় লিখিত হয়েছে আধুনিক মানুষের জটিল উপাখ্যান। এ-ভাষার জন্যে উৎসর্গিত হয়েছে আমার ভাইয়ের রঙিন বিদ্রোহী রক্ত। *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী* এ-বাঙলা ভাষারই জীবনের ইতিকথা। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ লেখক হিশেবে বিস্ময়র : তিনি একজন প্রধান কবি, ভাষাবিজ্ঞানী হিশেবে বাঙলাদেশে অদ্বিতীয়, সমালোচক হিশেবে অসাধারণ। কিছু দুরূহ গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। আবার কিশোরদের জন্যে অনন্য অনুপম ভাষায় তিনি লিখেছেন কয়েকটি সুখকর বই। *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনীতে* বাঙলা ভাষার ইতিহাস হুমায়ুন আজাদের হাতের ছোঁয়ায় হয়ে উঠেছে কবিতার মতো মধুর, সুখকর, ও সুন্দর।

ISBN 984-401-017-9

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~